প্রশ্ন ঃ ১৬. আনন্দ ও শোক প্রকাশের প্রচলিত প্রথা শরীয়ত বিরুদ্ধ এবং অবশ্য বর্জনীয়

(১) আনন্দোৎসব এবং শোক প্রকাশের বর্তমানে প্রচলিত লোকাচার "শরীয়ত সম্মত"—কোন মুসলমান একথা বলতে পারে না। কারো জানা না থাকলে এ সম্পর্কিত বই-পুস্তক পাঠ করা উচিত অথবা এ সমাবেশে উপস্থিত লোকেরা জেনে নিতে পারেন এর তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ। তাহলে শুনুন! আনন্দ ও শোক প্রথা দু-ধরনের। এক. যার নিন্দনীয় ও অবৈধ হওয়াটা সুস্পষ্ট। শিষ্ট-সম্ভ্রান্ত ও রুচিবান জনসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত। এখন কেবল নিম্নশ্রেণীর এবং দুষ্কৃতকারী জনগোষ্ঠীই এর পক্ষপাতী। যেমন—গান-বাজনা কিংবা নাচ-রংয়ের মাধ্যমে এ জাতীয় অনুষ্ঠান পালন করা। দুই. সেসব প্রথা যেগুলোর অবৈধতা অতি সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট । সাধারণ-অসাধারণ সমাজের সর্বস্তরের লোক জায়েয ও বৈধ ধারণা করেই এতে লিপ্ত হয়। এমনকি তাকওয়ার দাবি তুলে বলা হয়—আনন্দ আর উল্লাস প্রকাশে আমরা তো আর নাচ-গানের আসর জমাইনি, তাহলে এমন কি গুনাহ করে ফেললাম। কিন্তু প্রথমে আমাকে বলুন, গুনাহ্ বলে কাকে ? বলা বাহুল্য—শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়কেই গুনাহ ও পাপাচারে আখ্যায়িত করা হয়। চাই সেটা নাচ-গানের আকারে হোক, চাই অন্য কোন পন্থায়। কেননা নাচ হারাম এজন্যই যেহেতু শরীয়ত একে নিষেধ করেছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো—নাচ-গান ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আচার-অনুষ্ঠান শরীয়ত হারাম এবং অপরাধ সাব্যস্ত করেছে কি না ? "ইসলাহুর রুসুম" পুস্তিকায় এর বিশদ ব্যাখ্যা দেখে নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে এর একটা সংক্ষিপ্ত ও সীমিত পর্যালোচনার আলোকে বিষয়টাকে তুলে ধরার আমি চেষ্টা করছি। সবাই অবগত আছেন যে, কুরআন ও হাদীসে অহংকার ও গর্ব করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে! সুতরাং কুরআনের ভাষ্য ان الله لا يحب كل مختال فخور—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন গর্বিত-অহংকারীকে পছন্দ করেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر –

—অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার পোষণ করে এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অপর এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

من لبس ثوبا شهرة البسه الله ثوب الذل يوم القيامة –

—"যে ব্যক্তি সুনাম ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পোশাক পরাবেন।" অতএব বোঝা গেল অহংকারপূর্ণ মনে কোন কাজ করা হারাম। এ সম্পর্কিত অপর এক হাদীসের মর্ম হলো—লোক দেখানো ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে কাজ করা হারাম। এখন চিন্তা করুন!

বিয়ে-শাদীতে আমরা যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকি, যেমন আত্মীয়-স্বজন খাওয়ানো, মেয়েকে এটা-সেটা দেয়া ইত্যাদিতে আমাদের উদ্দেশ্য কি থাকে। বন্ধুগণ! সুন্দর সুন্দর শব্দের রং চড়ালেই জিনিসের স্বরূপ বদলায় না। নিয়তই হলো সবকিছুর মূল। সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আমাদের এসব কার্যকলাপ নিছক প্রথাগত আচরণ। এ উপলক্ষে বোনকে কিছু দান করে সেটাকে "সিলা রাহ্‌মী" তথা আত্মীয়তার বন্ধন আখ্যা দেয়া হয়। কি জনাব! আজ থেকে আটদিন পূর্বেও তো এ-বোন আপনার বোনই ছিল। আপনি কি তার খবর নিয়েছেন, তার অভাব মোচনে সহায়তা করেছেন ? দ্বিতীয়ত আত্মীয়তার উদ্দেশ্যে করা হলে লোক-সমাজে প্রদর্শনীর কি প্রয়োজন ? নিজের মেয়েকে কাপড় কিনে দিলে কিংবা খাওয়ানোর সময়ও কি আপনি আত্মীয়-স্বজন জড়ো করে প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকেন ? উত্তর যদি নেতিবাচক হয়, তবে যৌতুকের বেলায় লোক জমানোর উদ্দেশ্য কি ? এতে বোঝা গেল একমাত্র খ্যাতির উদ্দেশ্যেই এসবের আয়োজন। কাজেই এসব রেওয়াজ-প্রথার মূলে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান বলা হলে যথার্থই বলা হবে। আর কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সুনামের উদ্দেশ্যে কৃত যাবতীয় রেওয়াজ-রুসূম হারাম। বিশেষত একটা রেওয়াজ তো এতই ঘৃণিত যে তওবা দ্বারাও ক্ষমার আশা ক্ষীণ। কেননা এ থেকে তওবা করাও মুশকিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো—দৃশ্যত এটাকে ইবাদত মনে করে গর্ব করা হয়। সেটা হলো—বিয়ের মধ্যে উপহার (ঢাকার উত্তরাঞ্চলীয় ভাষায় 'শেউলী') সামগ্রীর আদান-প্রদান। মানুষ এটাকে "করযে হাসানা" তথা উত্তম ঋণ ধারণা করে বলে ঃ এর দ্বারা ভাই কর্তৃক অপর ভাইকে সাহায্য করা হয়। আর ভাইয়ের সাহায্য করা ইবাদত। যেন উপহার দান করা ইবাদত! অথচ এটা একটা অত্যন্ত ঘৃণিত প্রথা যা আপনাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এখনই আমি এর স্বরূপ তুলে ধরছি। আপনাদের কাছে তা নতুন ঠেকবে না, মনে হবে এ তো জানা বিষয়। কিন্তু মনোযোগ না দেয়ার কারণে সবাই ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। এ ক্ষেত্রে ভুলটা হচ্ছে কেবল ফল নির্ধারণে, নতুবা ভূমিকা সবার নিকট স্বীকৃত। যেমন কেউ বানান করল ت - ب যবর 'তাব' تب - ب - ت যবর 'বাত' কিন্তু টানা পড়ল بطخ তদ্রূপ আপনারাও বানান ঠিকই করেছেন, কিন্তু টানা পাঠে ভুল হয়ে গেছে। বিষয়টা এখন আরো পরিষ্কার করে বলছি। এটা সবাই স্বীকার করবেন যে, বিয়েতে দেয় উপহার মূলত ঋণভিত্তিক দান। আর ঋণ আদায় করা ওয়াজিব।

তৃতীয়ত, ঋণদাতার মৃত্যুর পর তার যাবতীয় ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিসদের মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়। চাই নগদ টাকা-পয়সা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হোক কিংবা

পাওনা ঋণ হোক। যেমন এক ব্যক্তি মারা গেল, তার সম্পদের মধ্যে রইল নগদ একশ টাকা আর পাওনাযোগ্য ঋণ একশ টাকা। এখন তার ত্যাজ্য সম্পত্তি মোট দু'শ টাকা হিসাবে আসবে। এখন অন্যান্য সম্পত্তির সাথে উক্ত দু'শ টাকা যোগ করত ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করতে হবে। আলোচ্য মাসআলা তিনটি জানার পর লক্ষ করুন, বিয়ের উপহারের ধরনটা কি হয়। বাস্তবে এর ধরন এই হয় যে, মনে করুন এক ব্যক্তি দুই টাকা করে পঁচিশ জায়গায় উপহার দিল। ফলে এভাবে তার মোট পঞ্চাশ টাকা ঋণ ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর একজন বালেগ একজন নাবালেগ দুই পুত্র রেখে সে মারা গেল। আর যাবতীয় সম্পত্তি দুইজনে আধাআধি সমান হারে ভাগ করে নিল, তাও বড়জন ঈমানদার হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাপের দেয়া উপহার-ঋণ তো কেউ ভাগ করে না। তাই বাস্তবে দেখা যায় উক্ত বড় ছেলের কোন সন্তানের বিয়ে হলে প্রাপ্য উপহার সবাই এখানে এনে জমা করে আর সেও নিজের হক মনে করেই সব ব্যয় করে। অথচ উক্ত পঞ্চাশের মধ্য হতে সে মাত্র পঁচিশের মালিক, বাকি অর্ধেক ছোট ভাইয়ের অংশ। সাধারণত উপহারের অবস্থা এই হয়। এখন আমার প্রশ্ন—ফরায়েযের বিধান মতে উপহার ভাগ করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত কেউ উপস্থিত করতে পারবে কি ? আমার বিশ্বাস, আদৌ না। এ ক্ষেত্রে গুনাহ দুই তরফা হলো। একে তো বড় ভাই অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল তসরুফ করার—যে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتمى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا -

—অন্যায়ভাবে যারা ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করে নিশ্চয়ই তারা যেন অগ্নিকুণ্ড উদরস্থ করল, শীঘ্রই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

দ্বিতীয়ত, উপহার প্রত্যর্পণকারী দুই শরীকের মাল এক শরীকের হাতে অর্পণ করে গুনাহ্র ভাগী হলো। অধিকন্তু তারা মনে করে—যাক, ঋণমুক্ত হলাম। অথচ ইয়াতীমের পঁচিশ টাকা এখনো তার দায়িত্বে বাকি। দুররুল মুখতার গ্রন্থে বর্ণিত আছে—কারো তিন পয়সা ঋণের দায়ে কিয়ামতের দিন সাত শ নামায পাওনাদারকে দেয়া হবে। এটা তো হলো যদি মালিকের ছেলেকে দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়—কয়েক পুরুষ গত হয়ে যায় তবু এ ঋণ আদায় করা হয় না। এমতাবস্থায় সকল হকদারের পরিচয় জানাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেউ বলতে পারে—বাপ-দাদার আমল থেকেই তো এ প্রথা চলে আসছে। জবাবে আমি বলব—এ কৈফিয়ত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্ব থেকে ধারা যদি এটাই চালু থাকত, তবে আজকে আমাদের পক্ষে মুসলমান হওয়া ভাগ্যে জোটার কথা নয়। আমাদের বাপ-দাদা

নিজেদের পূর্ব-পুরুষের রীতি-নীতি, রেওয়াজ-রুসুম বর্জন করেছিলেন বলেই না আজকে আমরা মুসলমান হিসেবে পরিচিত। কাজেই এ কৈফিয়ত অযৌক্তিক-অর্থহীন। এর একমাত্র সমাধান এটাই যে, সন্ধান করে করে পূর্বঋণ শোধ করে দেয়া এবং ভবিষ্যতে এ প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করা। এ ছাড়া আরবি কি ইংরেজি শিক্ষিত যে কোন ব্যক্তি আমাকে দ্বিতীয় কোন উপায় নির্দেশ করুক। বস্তুত বাহ্য দৃষ্টিতে গরীবের কিছুটা উপকার থাকা সত্ত্বেও ঋণভিত্তিক উপহার-প্রথা একটা ঘৃণিত রেওয়াজ। সেক্ষেত্রে উপকারবিহীন অন্যান্য রেওয়াজের আলোচনা না করাই উত্তম। এমনিতর প্রতি পদে পদে আমরা অভিনব প্রথা আবিষ্কার করে নিয়েছি যার অবর্তমানে শাদী-বিয়েই অচল। এসব প্রথার অন্তরালে পার্থিব ক্ষতি নির্দেশ করাটা আমার দায়িত্ব নয়, তা সত্ত্বেও গরীবের উপকার বিবেচনায় আনুষঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত করে দিচ্ছি। মুসলিম জাতির ওপর আপতিত বিপর্যয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব রেওয়াজ-প্রথারই ফল। কেননা সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য বিবর্জিত মুসলমানদের আয়-ব্যয়ের হিসাব কারো অজ্ঞাত নয়। ফল দাঁড়িয়েছে এই—আজ একজনের জমি বন্ধক, কালকে বাস্তু-ভিটায় ঋণের দায়ে ক্রোক নোটিশ, পরশু হয়তো দেখা গেল অলংকারপাতি, মালপত্র নিলামে চড়েছে অথচ এহেন পরিস্থিতিতেও প্রথা পালনে মিয়া সাহেবদের ঠাট কত! কেউ কেউ জবাব দেয়—আমাদের তো সামর্থ্য আছে, ঋণ লাগে না। জবাবে বলব—প্রথমত একথা স্বীকৃত নয়। কেননা প্রত্যেক স্তরের লোকই সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে ব্যয়ের অংক কষায় অভ্যস্ত। ফলে ঋণ গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, যদি স্বীকার করে নেয়াও হয় যে, তাদের ঋণের দরকার পড়ে না, তা সত্ত্বেও গরীব প্রতিবেশীর ওপর তাদের দৃষ্টি রাখা উচিত যে, আমাদের এ জাতীয় কার্যকলাপে উৎসাহিত হয়ে গরীবরা সর্বহারার দল ভারী করবে। তাই আমরাই বিরত থাকি। তৃতীয়ত, পার্থিব ক্ষতির আশংকা যদি না-ও থাকে, তবু অন্তত গুনাহ্র ভয়ে তো বর্জন করা উচিত। তদ্রূপ শোক প্রথাও নিছক সুনামের উদ্দেশ্যেই করা হয়, আল্লাহ্র জন্য নয়। কেননা আল্লাহ্র জন্য করা হলে বাহ্যিক আড়ম্বর এবং কষ্টকর প্রদর্শনীর আয়োজন ব্যতীত গোপনে করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাই বোঝা যায় একান্ত খ্যাতির জন্যই এ সবের আয়োজন। কথাটা এভাবেই পরীক্ষা হতে পারে—কোন রুসুমপন্থীকে যদি বলা হয়—এ অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তুমি পঞ্চাশ টাকা গোপনে দশ জন গরীবকে দান কর। কিছুতেই সে রাযী হবে না। বরং মনে মনে চিন্তা করবে বেশ তো মৌলভী সাহেবের রায়, গাঁট থেকে পঞ্চাশের অংক উড়ে যাবে অথচ কেউ তা জানবেই না, পঞ্চাশটি টাকাই তাহলে ভেস্তে যাওয়ার পালা।

বন্ধুগণ! এই হলো সমাজের অবস্থা। এর পরও বলা হয় মৌলবী সাহেব সওয়াব পৌঁছাতে পর্যন্ত বারণ করছেন। তাহলে বল—সওয়াব নিজেই কখন পেলে যে অপরকে পৌঁছাবে ? আমি যথার্থই বলছি যে, আলিমগণ সওয়াব পৌঁছাতে নিষেধ নয় বরং তা অর্জন এবং পৌঁছানোর যথার্থ উপায় নির্দেশ করেন মাত্র। আর সে পন্থা হলো—ডান হাতে দাও বাঁ হাতও যেন জানতে না পায়, নিজের নির্দিষ্ট অংশ থেকে দাও, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় দান করবে না, যাতে বালেগ নাবালেগ সকলে সমভাবে অংশীদার। দিতে চাইলে ভাগ করে নিজস্ব অংশ থেকে দাও। একত্র থাকাবস্থায় মোটেই দেবে না। এই হলো—সওয়াব হাসিলের সঠিক পন্থা। কিন্তু আপনাদের আবিষ্কৃত পন্থা সওয়াব লাভের উপায় নয়। মানুষ এক সাথে সুনাম ও সওয়াব দু'টিই লাভ করতে চায়, কিন্তু প্রদর্শনীতে সওয়াব কোথায়, এটা তো বরং আযাবের উন্মুক্ত দ্বার মাত্র। শেখ সাদী (র) বলেছেন ঃ

کلید در دوزخ است آن نماز
که در چشم مردم گذاری دراز

—লোক দেখানো, প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে প্রলম্বিত নামায মূলত জাহান্নামের দরজার চাবি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত কয়েকটি প্রথার বাস্তব নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো, অন্যগুলো এর উপর কিয়াস করা যেতে পারে। এবার আমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিভিত্তিক কয়েকটি প্রমাণ লক্ষ করুন। স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর বিয়ে দ্বারা মহানবী (সা) আদর্শ স্থাপন করেছেন, বিয়ে-শাদী কোন্ পন্থায় সম্পাদিত হওয়া উচিত। অনুরূপ রাসূল-তনয় হযরত ইবরাহীম (রা)-এর মৃত্যুতে শোক পালন দ্বারাও শোক প্রকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এরপরও মনগড়া আমল এবং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করা হলে অনুকরণ কোথায় হলো, এতে নবীর ভালবাসার কি প্রমাণ রইল ? অতঃপর আমাদের সমাজ-নামায সবই যেখানে শরীয়ত বিরোধী, এর সাথে সম্পর্কহীন এমতাবস্থায় কে বলতে পারবে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে আমাদের ভালবাসা সজীব-সতেজ। (আসারুল মুহাব্বত, পৃষ্ঠা ১৩)। (২) অর্থ সমাগমের উদ্দেশ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে তারা ইসালে সওয়াবের এমন পন্থা উদ্ভাবন করে নিয়েছে তাদেরকে ছাড়া এর সন্ধান পাওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। যেমন প্রথম قل هو الله পড়তে হবে, পরে تَبَارَكَ الَّذِىْ পরে এটা তারপর ওটা, কোন্ সূরায় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে হয়, কোন্টাতে হয় না ইত্যাদি। এগুলি এমন বিষয় মাওলানারা পর্যন্ত যার ইশারা-ইঙ্গিত ঠাওর করতে অপারগ। একমাত্র আবিষ্কারকরাই জানে এ সবের

মর্মকথা। তাই সাধারণ লোক সেদিকেই ছোটে। এভাবে তাদের দুই-দশ কড়ি আমদানির পথ হয়। এর মধ্যে তথাকথিত পীর সাহেবদের বিস্ময়কর সূক্ষ্ম চালাকি লক্ষণীয়। ঘটনা শুনুন, জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর আমার কাছে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বলল—তখন আমি কোন এক থানায় কর্মরত। এক ব্যক্তি এই মর্মে থানায় কেস ডায়েরী করাতে আসল যে, কে জানি তার 'ফাতিহা' চুরি করে নিয়ে গেছে। শুনে তো আমি বিস্ময়ে হতবাক, বলে কি! ফাতিহা চুরির কি অর্থ ? তাকে ব্যাপারটা খুলে বলতে বলায় সে বলল, তদন্তে চলুন, জানতে পারবেন। অবশেষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যা জানতে পারলাম তা নিম্নরূপ। বছরান্তে এক পীর সাহেব অত্র এলাকায় আসেন এবং এক বছরের জন্য ফাতিহা পাঠ করে নলের ভেতর আবদ্ধ করে যান—দরকার মত তা থেকে একটু একটু ঝেড়ে নিলেই হলো। নল প্রতি মাশুল ধার্য করা থাকে। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তির নিকট পয়সা ছিল না অথচ তার ফাতিহার দরকার, কাজেই সে অভিযোগকারীর গোটা নলটাই চুরি করে নিয়ে যায়। এই হলো কেসের বিবরণ। এর চাইতেও বিস্ময়কর ঘটনা মাওলানা গাংগুহী (র) বর্ণনা করতেন। কোন মসজিদে এক মোল্লা থাকত, সবাই তার দ্বারাই নিয়াস-ফাতিহা ইত্যাদি করিয়ে নেয়। একবার তার অনুপস্থিতিতে জনৈকা বৃদ্ধা খানা নিয়ে মসজিদে হাযির হয়। ঘটনাচক্রে সেখানে তখন এক বিদেশী মুসাফির বসা ছিল। বৃদ্ধা মনে মনে ভাবল, সওয়াবই তো উদ্দেশ্য, যাক মুসাফিরকেই দিয়ে দেই। খানা রেখে মসজিদের দরজায় মাত্র পা রেখেছে অমনি ইমাম সাহেব হাযির। জিজ্ঞেস করল, বুড়ি মা কি মনে করে এদিকে ? বৃদ্ধার মুখে ঘটনা শুনে শীঘ্র মসজিদে প্রবেশ করে ইমাম সাহেব লাঠি হাতে হৈ-হুল্লোড় করে বিছানাপত্র ঝাড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে দুড়ুম করে মেঝেতে পড়ে গেল। শোরগোল শুনে মহল্লাবাসী জমা হয়ে জিজ্ঞেস করল, মোল্লাজী ব্যাপার কি ? বলতে লাগল, ভাইসব! দীর্ঘদিন যাবত আমি এখানে আছি, সব মুর্দাকে আমি চিনি, সওয়াব আমি তাদেরকেই পৌঁছাই। নতুন লোক সওয়াব না জানি কোথায় বখশিয়েছে। আর তো এখানকার সকল মুর্দার আমাকে ধরেছে। ছাড়াবার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু একা আর কত কুলায়। অবশেষে ক্লান্ত দেহে লুটিয়ে পড়েছি। দু-চার বার এরূপ ঘটলে আমি মরেই যাব। তাই বিদায় নেয়াই আমার উচিত। লোকেরা বলল, মোল্লাজী আর কোথাও যেতে হবে না, সবকিছু আমরা আপনাকেই পৌঁছাব।

মোটকথা, স্বার্থকেন্দ্রিক এসব প্রথার বিনিময়ে যখন কিছুই মিলবে না তখন পৃথক ঠিকানায় ফাতিহা পৌঁছানো তাদের নিজেদের কাছেই বেতাল ঠেকবে। এভাবেই

এসব প্রথা সমাজ থেকে নির্মূল হতে থাকবে। এসব প্রথা দীনের অঙ্গবহির্ভূত হওয়ার এটাও একটা নিদর্শন। কারণ শরীয়তের মূল বিষয় সর্বদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। তাই দেখা যায়, কেবল শরীয়তসিদ্ধ বিষয়ই যথাস্থানে বাকি থাকে। দেখুন, "কি মিয়া এখন সেসব প্রথা পালিত হয় না কি কারণে ?" আমার এ প্রশ্নের জবাবে কয়েকজন বলল—ক'জনের চল্লিশা পালন করব, মড়ক মহামারীর যা অবস্থা চল্লিশা-কুলখানি তো নিত্যদিন লেগেই আছে। আমি বললাম ঃ এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এসব প্রথা-পার্বণ শরীয়ত বহির্ভূত জিনিস। মহামারী সত্ত্বেও তো এমনটি হয়নি যে, কোন মুর্দার নামায-কাফন ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। অথচ অনেকেরই কুলখানি-চল্লিশা পালিত হয়নি। মোটকথা, দীনের কাজেও নানান প্রথা আবিষ্কার করা হয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের আশা সুদূরপরাহত।

—ইহ্সানুত্তাদবীর, পৃষ্ঠা ১৯

(৩) আরো একটি উল্লেখযোগ্য প্রথা হলো—বরযাত্রা, যা মূলত হিন্দুদের আবিষ্কার। এর পটভূমিকা হলো—পূর্ববর্তী যমানায় রাস্তা-ঘাট নিরাপত্তাহীন ছিল বিধায় নববধুর হিফাযতের উদ্দেশ্যে রক্ষী হিসেবে একদল লোকের প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশ্যে পরিবার প্রতি একজন করে লোক বাছাই করা হতো যেন কোন অঘটন ঘটলে প্রতি পরিবারের মাত্র একজনই বিধবা হয়। কিন্তু এখন তো নিরাপত্তা বিরাজমান, তাই এত লোকের কি প্রয়োজন ? আর কোন আশংকা যদি সত্যি থাকে, তবে কনেকে এভাবে অলংকার সজ্জিত করার কি অর্থ ? যদি বলা হয়—বরযাত্রার পিছনেও নিরাপত্তামূলক কল্যাণ চিন্তা নিহিত আছে। তবে এর কি জবাব যে, বরযাত্রীরা যায় তো দল বেঁধে, কিন্তু আসার পথে যে যার পথে ফেরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। প্রায়শ বৌ নিয়ে বেহারাকে একাই ফিরতে দেখা যায় কেন ? বাস্তব কর্ম দ্বারা প্রমাণ তো এটাই হয় যে, বৌ-রক্ষা উদ্দেশ্য নয়, নিয়ত হলো—সামাজিক প্রথার অনুশীলন এবং সুনামের চিন্তা। তদুপরি সাধারণত বৌ নিয়ে রওয়ানা হয় যখন বেলা তখন ডুবে ডুবে। আর মা-বাপও এহেন পড়ন্ত বেলায় মেয়ে বিদায় করে। সম্ভবত তাদের ধারণা, মেয়ে কি আর এখন আমাদের আছে ? তা-না হলে এখন তো আরো বেশি করে হিফাযতের দরকার। কেননা কন্যা এখন গয়না-গাটি জড়ানো, পথে আল্লাহ্ জানে কোন বিপদে পড়ে কি না।

বন্ধুগণ! দীন ছেড়ে দিলে মানুষের বিবেকও বিদায় নেয়। সাধারণত মানুষের ধারণা বিবাহিতা মেয়ের তুলনায় কুমারী মেয়ের হিফাযত বেশি প্রয়োজন। এ ধারণা হিন্দু সমাজ থেকে উদ্ভূত। এর রহস্য হলো—তারা মনে করে কুমারী মেয়ের চরিত্রে কোন অবাঞ্ছিত কথা উঠলে সমাজে কলংক রটে, কিন্তু বিয়ের পর হলে সে ভয় নেই। কেননা তার স্বামী আছে, সে-ই বুঝবে। কিন্তু এ ধারণা মূর্খতাপ্রসূত। বিবেকবুদ্ধির আশ্রয় নিলে দেখা যাবে কুমারী মেয়ের তুলনার বিবাহিতা মেয়ে হিফাযতের অধিক মুখাপেক্ষী। কারণ কুমারীর স্বাভাবিক লজ্জাই তাকে অপকর্ম থেকে নিরাপদ রাখে। পক্ষান্তরে বিয়ের পর বিবাহিতার জন্মগত লজ্জার আবরণ ছিন্ন হয়ে মানসিক প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। তাই তার চারিত্রিক নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা থাকা চাই। দ্বিতীয়ত কুমারী মেয়ের স্বাভাবিক লজ্জা ছাড়া কলংকের ভয় অধিক। কিন্তু বিয়ের পর সে বালাই থাকে না এবং তার দুষ্কর্ম স্বামীর আড়ালে ঢাকা দেয়া সম্ভব। তাই সে অপেক্ষাকৃত নির্ভয় হওয়ার কারণে কুমারীর তুলনায় তার মন-মানসিকতা কুকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সহজতর। কাজেই তার হিফাযতই বেশি হওয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপ এর বিপরীত। কারণ মানুষ আজকাল মান-সম্মান অপেক্ষা দুর্নামের গুরুত্ব বেশি দেয়। কাজেই এর আশংকায় বিবাহিতার তুলনায় কুমারীর মান রক্ষায় অধিক তৎপর হয়। তারা মনে করে হিফাযতের সময়কাল বিয়ের আগে নির্ধারিত । এ ধারণার বশবর্তী হয়েই পিতা-মাতা অসময়ে মেয়ে বিদায় করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু পাত্রপক্ষ না হোক অন্তত পাত্রীপক্ষের তো এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। এই হলো বরযাত্রার তাৎপর্যগত ত্রুটি। আমার দৃষ্টিতে এসব ত্রুটি স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে অবশ্য আমিও বরযাত্রায় শরীক হয়েছি। কিন্তু বুঝে আসার পর এখন আমি এ প্রথা হারাম মনে করি। কারো বুঝে না আসলে আমার রচিত 'ইসলাহুর রুসুম' পুস্তিকা দেখে নিতে পারে। এসব রেওয়াজ-প্রথা নিষেধ করার কারণেই জনৈক গ্রাম্য লোক আমায় বলে বসে—শুনলাম আপনার মাসআলা নাকি কড়া খুব বেশি। বললাম, মাসআলা এমনি হওয়া উচিত যাতে সতর্কতা বেশি থাকে। বস্তুত মাসআলা আমার কড়া ঠিক নয়; তবে আল্লাহ্ আমার কলম দ্বারা কোন কোন বিষয়ের অপকারিতা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যার প্রকাশে অন্যরা বিরত। কাজেই আমাকে কঠোর প্রাণের চিত্রিত করা হয়।

মোটকথা, বরযাত্রার উদ্দেশ্য যদি কনের হিফাযত করাই হয়; তবে তাদেরকে একা ফেলে সঙ্গীরা যার যার পথ ধরে কেন ? কেউ হয়তো বলতে পারে—ভয়ের কি আছে বর তো সাথেই। বলব—বাস্তবের সাক্ষী কিন্তু এর বিপরীত। কেননা আজকালের দুলা মিয়াদের যে সাহস, রাস্তায় চোর-ডাকাতের আক্রমণ হলে সবার আগে সে-ই ডুলিতে লুকায়। সময় সময় দেখা যায় মাত্র কয়েকজন সাথীসহ বর-কনে পথে কোন গ্রামে রাত কাটাচ্ছে আর বরযাত্রীরা আগেই চলে আসছে। অথচ তারা

গিয়েছিল হিফাযতের উদ্দেশ্যে। অতএব বর্তমান পরিবেশে বরযাত্রা প্রথা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। —দাওয়াতে আবদিয়ত, ষষ্ঠ খণ্ড, আযলুল জাহেলিয়াত, পৃষ্ঠা ৫৫

প্রশ্ন ঃ ১৭. স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বিবাহে স্বামীর পরিবারের লোকদের অধিকার স্বীকৃত নয়।

কোন কোন মুসলিম সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নীকে নিজেদের অধিকারভুক্ত মনে করা হয়। অর্থাৎ মাতা-পিতা কর্তৃক বিধবা কন্যার বিয়ের ব্যবস্থাপনা অস্বীকার করে দেবর-শ্বশুরের মালিকানাভুক্ত মনে করা হয়। এমনকি বিধবার আত্মমালিকানা পর্যন্ত স্বীকার করা হয় না যে, স্বেচ্ছায় সে কোথাও বিয়ে বসবে। যেমন পিতার ইচ্ছা কন্যাকে আমি অন্যত্র বিয়ে দেব কিন্তু শ্বশুর তাতে বাদ সাধে যে—না, বিয়ে আমার ছোট ছেলের সাথেই দেব আর বৌমাকে বাড়িতেই রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিতার মতামত স্পষ্টত উপেক্ষা করা হয়। সুতরাং এক স্থানে দেখা গেছে জনৈক মহিলা তার বিধবা পুত্রবধুকে নিজের বাচ্চা ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। এখন পরিতাপের বিষয় হলো—মেয়েদের বিবেক তো গেছেই, সাথে সাথে পুরুষদের জ্ঞানও হারিয়ে গেছে। তারাও এর গুরুত্ব বিবেচনা করতে নারাজ। কাজেই তখন নারী জাতিকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করা অবৈধ ঘোষণাকারী আয়াত আমি তিলাওয়াত করি, যাতে বলা হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ـ وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَّعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

—হে মু'মিনগণ! নারীকে বলপূর্বক মীরাসী সম্পদ বানিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, আর তাদেরকে তোমরা নিজেদের প্রদত্ত সম্পদ করায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে আটক করো না, অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। (তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা) তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। তাদেরকে যদি পছন্দ না হয় তাহলে হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অপ্রিয় কিন্তু আল্লাহ্ তাতে অধিক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

আয়াতের মর্ম লক্ষ করুন। দেখুন কুরআন এ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কি-না ? লক্ষণীয়, আয়াতে বর্ণিত كرها শব্দ দ্বারা সমাজের বাস্তব চিত্রের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে মালিকানাভুক্ত হওয়াটা নারীদের পছন্দনীয় হতে পারে

না। আর যদি ব্যতিক্রমধর্মী কারো কারো এমনটি হয়ও তবু স্বাধীন নারীকে মীরাসে পরিণত করা জায়েয নয়।

এ পর্যায়ে কেউ কেউ বলে—আমরা তো তার স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছিলাম। আমি বলব—এটা বাস্তবের চিত্র নয় বরং নিছক লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। কেউ যেন বলতে না পারে যে, সম্মতি ছাড়াই মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ বিধবার বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য মৌখিক সম্মতি প্রদান অনিবার্য।

বাস্তবে এমনও দেখা যায়, জিজ্ঞাসা ছাড়াই বিয়ে দেয়া হয়েছে। নানুতায় একবার জনৈকা বিধবার সম্মতি ব্যতীতই বিয়ে পড়িয়ে বলপূর্বক তাকে বরযাত্রীদের সাথে দেওবন্দ পাঠিয়ে দেয়া হলো। বলে দেয়া হলো—সেখানে পৌঁছে সম্মত করিয়ে নেবে। আমাদের এখানে ইদ্দতের মধ্যেই এক মেয়ের বিয়ে পড়ানো হলো। আমি যখন বললাম, তোমরা একি দুষ্কর্ম করলে? তারা বলল—আসলে বিয়ে তো নয়, একটা চাপ রাখা হলো মাত্র যাতে অন্যত্র বিয়ে বসতে না পারে। কিন্তু ইদ্দত শেষে হতভাগারা আর বিয়েই পড়াল না। অতঃপর লোকেরা মন্তব্য করতে লাগলো যে, এ পাপের দরুনই বসন্ত, মহামারী দেখা দিয়েছে। ঠিকই বলেছে—হালালের আবরণে এভাবে হারাম কাজ সমাজে চলতে থাকলে মহামারী আসবেই না কেন ?

বন্ধুগণ! এ পর্যায়ে কবিতার ছন্দ লক্ষ করুন। কবি বলেছেন—

از زنا افتد وبا اندر جهان

—ব্যভিচারের ফলে সমাজে মহামারী দেখা দেয়ই।

কেউ কেউ নামকাওয়াস্তে মুখে বলিয়ে নেয় বটে কিন্তু সেটাও তো অন্যায়। কেননা নিজেদেরকে হর্তাকর্তা, মালিক মনে করেই তারা বিধবার স্বীকারোক্তি আদায় করে নেয়। তাতে মাতা-পিতার মালিকানা পর্যন্ত স্বীকার করা হয় না। অথচ আল্লাহ্-রাসূলের পর সর্বাগ্রে পিতা-মাতাই আনুগত্যের দাবিদার। (ঐ, পৃষ্ঠা ৫৮)

প্রশ্ন ঃ ১৮. মেয়েকে কক্ষবন্দী করার প্রথা অবৈধ।

আমাদের সমাজে আরেকটা নিপীড়নধর্মী প্রথা চালু রয়েছে যে, প্রাক-বিবাহকালে কনেকে এক কোঠায় বন্দী করে দেয়া হয়। চলতি কথায় যাকে বলা হয় "কনের নির্জন কক্ষবন্দী।" অর্থাৎ বিয়ের আগে আলো-বাতাসহীন কক্ষে কনেকে আবদ্ধ রাখা হয়। এমতাবস্থায় কারো সাথে কথা বলা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাওয়া ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ থাকে। প্রস্রাব-পায়খানাতে সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমনকি পিপাসায় পানি চাওয়া পর্যন্ত সে হতভাগীর জন্য নিষিদ্ধ। বিবাহোত্তর সময়ে নববধু কারো সাথে দু' কথা বলে ফেলল কিংবা মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল অমনি চার দিকে হৈ চৈ পড়ে

গেল—হায়! হায়! কি নির্লজ্জ সময় আসল রে বাবা! একেবারে ঘোর কলিকাল। এসব তো হলো উক্ত প্রথার নির্যাতনী উপহার। কিন্তু শুধু কি তাই ? নিজ মুখে পানি চাওয়াও নতুন বৌ-এর অপরাধ! তাই সে নামায পড়বে ওযূর উপায় থাকলে তো ? পরিবারের মুরুব্বীরা বৌ-এর নামাযের খবর নেবে কি, নিজের নামাযেরই তো খবর নেই। তাই দুনিয়া তো গেলই, আখিরাতও বিনাশ। অথচ মরণকালেও নামায পড়া থেকে অব্যাহতি নেই। সুতরাং কিতাবে আছে নৌকাডুবির ফলে একটি লোক ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু এহেন ডুবন্ত অবস্থায়ও সময় হলে নামাযের নিয়ত বাঁধা তার ওপর ওয়াজিব, পরে সে বাচুক কিংবা ডুবুক। এই তো হলো নামাযের প্রতি তাকীদ ও গুরুত্ব। কিন্তু প্রথার ফেরেচক্রে তাও গেল। মানুষকে পশুর স্তরে নয় বরং জড় বস্তুতে পরিণত করে এহেন অনাচার বিদ্যমান থাকাবস্থায় শরীয়ত কিংবা বিবেক কোন্ যুক্তিতে এ প্রথা বৈধ হতে পারে ? মেয়ের পানাহার বন্ধ রাখা হয় কেবল এ যুক্তিতে যে, অল্প মাত্রায় খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তোলা না হলে শ্বশুরালয়ে পানাহারের দরুন মেয়েকে পায়খানা করতে হবে যা শালীনতার পরিপন্থী। স্থান বিশেষে এমনও দেখা যায় অনাহারের দরুন মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ। বস্তুত দীনবর্জিত হলে বিবেকও লোপ পেয়ে যায়। বিয়ের প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতার পরিধি ব্যাপক। এর যে কোন অংশ শরীয়তবিরোধী তো বটেই, বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী।

—মুনাযাআতুল হাওয়া, পৃষ্ঠা ৬২, দাওয়াতে আবদিয়ত, সপ্তম খণ্ড

প্রশ্ন ঃ ১৯. চল্লিশা ইত্যাদির খানা নিছক আত্মীয়দের মনতুষ্টির ফলশ্রুতি।

দাওয়াতের আয়োজন কার কত বিপুল, শুধু এটা দেখার উদ্দেশেই চল্লিশার অনুষ্ঠান। শোকের ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষণ তো এটাই যে, সওয়াবের উদ্দেশেই এ ব্যবস্থাপনা। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে নির্জনে ডেকে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দান করাটাই অধিক সওয়াবের কাজ আর এটাই ইসলামের বিধান অথচ ধনী ব্যক্তিরাই তোমাদের দাওয়াতী মেহমান। কাজেই এ অনুষ্ঠানে বরাদ্দকৃত টাকা তোমরা অমুক মাদরাসায়, অমুক মসজিদে কিংবা অমুক সম্ভ্রান্ত অভাবী লোকটিকে গোপনে দান করে এস এবং এর সওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে বখশিয়ে দাও। তখন লক্ষ করুন তার মনের গতি যে কি হয়। সে এই বলবে—সুবহানাল্লাহ্! টাকাও গেল অথচ কেউ জানতেও পেল না! এখন বলুন! এটা সুস্পষ্ট 'রিয়া' (প্রদর্শনী) কি-না। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মূলত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই এসব আয়োজন-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় সওয়াবের আশা করা বৃথা।

সুতরাং কর্তাই যেখানে শূন্য হাত, সেক্ষেত্রে মুর্দাকে সে পৌছাবে কি ? কারণ সওয়াব পৌছানোর অর্থ এটাই যে, সৎকাজের বিনিময়ে তোমার প্রাপ্ত সওয়াব অপরকে তুমি দান করে দিলে। কিন্তু তোমার নিজের খাতাই যেখানে শূন্য সেখানে পরকে বিলাবে কি ? এ ব্যাপারে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল। রামপুরের জনৈক ব্যক্তি এক ভণ্ড পীরের মুরীদ হয়। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল—বল পীর সাহেবের সান্নিধ্যে কি ফয়েয হাসিল হলো ? বেচারা ছিল সরল প্রাণের, বলল—ভাগুই যেখানে শূন্য সেখানে লোটায় পানি পড়বে কোত্থেকে ? সওয়াবেরও একই অবস্থা। আমলকারীর নামে সওয়াব প্রথম জমা হবে, তবেই না অপরকে সে বিলাবে। সে নিজেই যখন বঞ্চিত তাহলে অন্যজনকে সে দেবেটা কি ? সুতরাং এসব শুধু প্রথা আর প্রদর্শনীর অনুশীলন এবং আত্মীয়ের তুষ্টি সাধন ছাড়া কিছুই নয়। পরিণামে কেবল অর্থের অপচয়। কেউ কেউ মুখে এ কথা স্বীকার পর্যন্ত করে থাকে।

'কীরানা'তে জনৈক গোয়ালা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পুত্র হাকীমকে গিয়ে ধরেছে, হাকীম জী! এইবার অন্তত কোনমতে আমার পিতাকে সারিয়ে দিন। বুড়ার মরার চিন্তা তো করিনা কিন্তু আজকাল চালের যে দর, বুড়া মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত খাওয়ানোই সমস্যা। সে ছিল সরল-সোজা, সত্য কথা মুখের ওপর বলে দিয়েছে। আমরা মর্যাদাবান কি-না, তাই মুখে তো বলি না কিন্তু অন্তরে সবার একই ভাব। এ তো গেল যারা খাওয়ায় তাদের অবস্থা। কিন্তু এ উপলক্ষে দাওয়াত যারা খায় তারা চরম নির্লজ্জ। এহেন অবস্থায়ও সমবেদনার পরিবর্তে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের ওপর উল্টো বোঝা চাপানো হয়। এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি ঘটনা বর্ণনা করে যে, "বুলন্দশহর" জিলায় জনৈক বিত্তশালী ধনী ব্যক্তি মারা যায়। চল্লিশতম দিনে তার সব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হাতী-ঘোড়া চড়ে প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়। ধনীপুত্র যথারীতি সবার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা নেয় এবং অতিথি-অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্টমানের খাবার প্রস্তুত করে। খানা পরিবেশনের পর সবাই দস্তরখানে সমবেত হলে ধনীপুত্র দাঁড়িয়ে এই বলে বক্তব্য রাখল ঃ সমবেত অতিথিবৃন্দ! খানার পূর্বে আমার একটি কথা শুনুন, অতঃপর খাওয়া শুরু করুন। এ মুহূর্তে আপনাদের এখানে একত্রিত হওয়ার কারণ কারো অজানা নয় যে, পিতার ছায়া আমার ওপর থেকে বিদায় হওয়ায় আমি এখন শোকসাগরে নিমজ্জিত। তাই আমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই আপনাদের আগমন। তাহলে সমবেদনা কি এরি নাম যে, সন্তাপ-পীড়নে তো আমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ আর আপনারা হাত গুটিয়ে বসে গেলেন সুস্বাদু-সুপেয় খাদ্য খেতে। লজ্জার কি আপনাদের বালাই নেই ? এখন

খানা শুরু করুন। কিন্তু এ অবস্থায় খাবে কে ? গণ্যমান্য সবাই উঠে গিয়ে একস্থানে পরামর্শের জন্য বসে গেল যে, চল্লিশার এ প্রথা বাস্তবিকই উঠিয়ে দেয়া জরুরী। অবশেষে এ প্রস্তাবে সবাই একমত হয়ে দস্তখত করে এবং সমস্ত খানা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। বস্তুত চিন্তা করলে দেখা যায় আত্মীয়-স্বজনদেরকে নিয়ে এ উপলক্ষে আয়োজিত খানা এমন ঘৃণিত যে, এর আয়োজনকারীর অহেতুক পরিশ্রম আর আমন্ত্রিতদের লজ্জাহীনতা ব্যতীত এর সারবত্তা বলতে কিছুই নেই। অথচ লোকদের অভিযোগ হলো—আলিমরা ইসালে সওয়াব থেকে মানুষকে নিষেধ করে। কিন্তু বন্ধুগণ! ইসালে সওয়াব থেকে তো কেউ নিষেধ করছে না। বরং নিষেধ হলো অনিয়ম ও নীতি বিরুদ্ধ কার্যকলাপ থেকে। চিন্তা করুন, কেউ কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে নামায পড়লে নিষেধ করা হবে কি হবে না ? আন্তরিকতা, সওয়াবের উদ্দেশে এবং নিষ্ঠা ও শরীয়তসম্মতভাবে কেউ আমল করলে তাকে বাধা দেয় সাধ্য কার ?
—আদ্‌দীনুল খালিস, পৃষ্ঠা ৪৫

প্রশ্ন ঃ ২০. মহানবী (সা)-এর পুণ্যস্মৃতিসমূহে বর্তমানে সীমালংঘন করা হচ্ছে, ঈমান ব্যতীত এসব কল্যাণকর নয়।

এক ঃ মহানবী (সা)-এর পুণ্যস্মৃতি সম্পর্কে অন্যান্য বিদআতের ন্যায় বর্তমানে সীমালংঘনজনিত একই আচরণ তথা একে ঈদ উৎসবে পরিণত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোক এমনকি কোন কোন তালেবে ইলম পর্যন্ত সন্দিহান। তারা মনে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোর্তা মুবারকের যিয়ারত বরকতের বিষয়। কাজেই তা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা দূষণীয় নয়। জালালাবাদের জনৈক মাদরাসা ছাত্র একবার তার দোকানে বসেই কোর্তা মুবারক যিয়ারতের অনুমতি চাইলে আমি তাকে নিষেধ করলাম। উল্লেখ্য, তার দোকানের পাশেই পুণ্য জামা- রক্ষিত স্থান অবস্থিত। আমার নিষেধের কারণ এই ছিল যে, উরস-উৎসবের ন্যায় এর জন্য মেলা বসানো হতো। এ উদ্দেশে নির্দিষ্ট তারিখে মানুষকে দাওয়াত দেয়া হতো। দূর-দূরান্ত থেকে নারী-পুরুষ একত্রিত হতো। এতে এমন সব লোকও উপস্থিত হতো যারা নামায পর্যন্ত পড়ে না। কোর্তা-মুবারকের মর্যাদা মহানবী (সা)-এর রওযা মুবারকের সমকক্ষ হতে পারে না। অথচ সে রওযা পাক সম্পর্কেই হাদীসে নিষেধ বাণী ঘোষিত হয়েছে ঃ

لا تتخذوا قبرى عيدا

—আমার কবরকে তোমরা ঈদ উৎসবে পরিণত করো না।

অবশ্য মিলাদুন্নবীর ন্যায় এতেও রূপান্তর ঘটেছে কিংবা ঘটেনি কোনটাই নিশ্চিত বলা যায় না। যে কথা অন্তরে নেই তা মুখে উচ্চারণ না করাই উত্তম। রওযা ও কুর্তা

এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যের উপাদান এখানেও বর্তমান রয়েছে। তা হলো—কুর্তা মুবারক পবিত্র শরীর মুবারকের সাথে এ মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট নয়, কিন্তু রওযা পাকের সাথে তা এখন রয়েছে। এ কারণেই মহানবী (সা)-এর কুর্তা মুবারককে কেউই কবর অপেক্ষা আফযল বা সম্মানিত বলেননি। সুতরাং কবর শরীফকে ঈদে পরিণত করা যে ক্ষেত্রে হারাম সে ক্ষেত্রে জামা মুবারককে ঈদে পরিণত করা কি করে জায়েয হতে পারে ? কোথাও কোথাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র কেশগুচ্ছ এখনো বর্তমান রয়েছে, সেগুলোকেও ঈদে পরিণত করা জায়েয নয়। কেশ মুবারক দেহের অংশ, এ কারণে দৃশ্যত তার মর্তবা কবর অপেক্ষা অধিক হওয়ার কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু কবরের সাথে দেহের উপস্থিত সান্নিধ্যের ফযীলত ও প্রাধান্য বিদ্যমান যা পুণ্য কেশের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এ কারণে উভয়টি সমমর্যাদাভুক্ত যে, পুণ্য কেশ দেহের অংশ কিন্তু উপস্থিত সান্নিধ্য নেই আর কবর শরীরের অংশ নয় কিন্তু দেহের স্পর্শ বর্তমান। সুতরাং উভয়টি এখন সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। আর পরস্পর সমপর্যায়ের একটি দ্বারা অপরটির হুকুম জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব لا تتخذوا قبرى عيدا (আমার কবরকে তোমরা ঈদের উৎসবে পরিণত করো না) হাদীসের আলোকে পবিত্র কেশ মুবারককে ঈদ-উৎসবে পরিণত করা হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায়। এটা মহানবী (সা)-এর চরম ভাষালংকারপূর্ণ বাক্যের পরিচায়ক যে, তিনি কবর উল্লেখ করেছেন, যদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র, কেশ ইত্যাদির হুকুম স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবগত হওয়া যায়। এ ছাড়া সাহাবা কিরাম এবং সলফে সালিহীনের নিকট মহানবী (সা)-এর পুণ্যস্মৃতিচিহ্ন আমাদের অপেক্ষা পরিমাণে অধিক ছিল। তদুপরি তাঁরা পুণ্য কাজে আমাদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা এ ব্যাপারে উৎসবের পন্থা অবলম্বন করেননি। তাই এটা কোন কল্যাণধর্মী বৈধ কাজ হলে সলফের মধ্যে এর কোন না কোন সূত্র অবশ্যই বর্তমান থাকার কথা। এখন প্রশ্ন থাকে—সাহাবীগণের মধ্যে ঈদ-উৎসবের ন্যায় গণসমাবেশ ছিল না তাহলে মহানবী (সা)-এর পুণ্যস্মৃতির সাথে তাঁদের আচরণ কিরূপ ছিল ? এ ব্যাপারে হুবহু শব্দ মুখস্থ রাখা কঠিন বিধায় এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস আমি কাগজে নোট করে নিয়েছি। এখন তা-ই বর্ণনা করছি।

হাদীস (১) ঃ

عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال فارسلنى اهلى الى ام سلمة بقدح من ماء وكان اذا اصاب الانسان عين او شئى بعث اليها مخضية لها فاخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تمسكه فى جلجل من فضة فخضخضت له فشرب منه قال فاطلعت فى الجلجل فرأيت شعرات حمراء -

—উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক পেয়ালা পানিসহ পরিবারের লোকেরা আমাকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার নিকট প্রেরণ করে। নিয়ম ছিল কারো চোখ ইত্যাদিতে কোনরূপ পীড়া দেখা দিলে হযরত উম্মে সালামার নিকট পানির পেয়ালা পাঠিয়ে দিত। মহানবী (সা)-এর এক গুচ্ছ কেশ তিনি রূপার নলে পুরে নিজের কাছে রেখেছিলেন। উক্ত পানির মধ্যে তিনি কেশ মুবারক চুবিয়ে দিতেন আর তা রোগীকে পান করানো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত নলটি আমি ঝুঁকে দেখলাম তাতে লোহিত বর্ণের কয়েকটি কেশ ছিল। —সহীহ্ বুখারী

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন সাহাবিয়ার নিকট নলের মধ্যে রক্ষিত পুণ্য কেশের সাথে আচরণ এই ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে এর ধোয়া পানি পান করানো হতো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিযাব সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। বিশুদ্ধ মত এই যে, তাঁর চুলে মাত্র পাক ধরেছিল, যাতে খিযাব বলে দর্শকের সন্দেহ হতো। তাছাড়া তিনি চুলে কখনো খিযাব ব্যবহার করেননি। কেননা মহানবী (সা)-এর বিশটি কিংবা এর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি চুল মাত্র শুভ্র বর্ণ ধারণ করেছিল।

হাদীস (২) ঃ

عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها انها اخرجت جبة طيالسية كسروانية لينة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها كان النبى صلى الله عليه وسلم يلبس بها فنحن نغسلها للمرضى نستشفى بها –

—হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুই ফাড়ার মধ্যে রেশম খচিত তাইলিসানী, কেসরাভী একটি জামা বের করে বললেন—এই হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবহৃত জামা যা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর আমি তা সংগ্রহ করেছি। মহানবী (সা) এটি পরিধান করতেন। এখন রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে এটা ধুয়ে রোগীকে আমরা পানি পান করিয়ে থাকি। —সহীহ্ মুসলিম

হাদীস (৩) ঃ

ثم وعن انس قال النبى صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا

طلحة الانصارى فاعطاه اياه ثم ناول الشق الا يسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس –

—হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে আরাফা থেকে মিনা আগমন করে জামরা আকাবার নিকট পৌছেন এবং 'রমী' করেন। অতঃপর মিনায় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অবস্থান স্থলে ফিরে এসে কুরবানীর পশু জবাই করেন আর ক্ষৌরকার ডেকে প্রথমে মাথার ডান দিক এগিয়ে দিলে সে তা মুণ্ডন করে। এরপর তিনি আবূ তালহা আনসারীকে ডেকে মুণ্ডিত কেশ তাকে দান করেন। অতঃপর ক্ষৌরকারকে মাথার বাঁ পাশ এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ মুণ্ডন কর, উক্ত অংশ সে মুড়িয়ে দিলে মুণ্ডিত এ কেশগুলিও তিনি আবূ তালহা আনসারীর হাতে অর্পণ করে বললেন ঃ এগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পবিত্র কেশ সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সাহাবীগণ পূর্ব-পশ্চিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কাজেই কোথাও পবিত্র কেশ পাওয়ার সংবাদ শোনামাত্রই তা অস্বীকার করা উচিত নয়। বরং বিশুদ্ধ সনদ সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে তার সম্মান করতে হবে। আর মিথ্যা হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না গেলে নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম। অর্থাৎ স্বীকার-অস্বীকার কোনটাই না করা উচিত। সন্দেহযুক্ত ব্যাপারে শরীয়ত আমাদেরকে এ শিক্ষাই দান করে।

হাদীস (৪) ঃ

وعن ام عطية فى قصة غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفينها انها قالت فالقى حقوه فقال اشعرنها اياه ـ فقال الشيخ فى اللمعات وهذا الحديث اصل فى البركة باثار الصالحين ولباسهم –

—উম্মে আতিয়া হযরত যায়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসল ও কাফনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় লুঙ্গি মুবারক আমাদেরকে দিয়ে বললেন ঃ এটি সবার নীচে রেখে মরহুমার দেহের সাথে জড়িয়ে কাফন পরিধান করাও, এর বরকত যেন শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'লুমআতের' গ্রন্থকার শায়খ আবদুল হক (র) অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উক্ত হাদীস পুণ্যাত্মাগণের নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা বরকত হাসিল করার ভিত্তিস্বরূপ।

এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মৃত্যুর পর কাফনের সাথে স্মৃতিচিহ্ন জড়িয়ে দেয়াটাও পুণ্যস্মৃতি দ্বারা বরকত লাভের একটি উপায়। কিন্তু তাই বলে কুরআন এবং দোয়ার কিতাব কাফনের সাথে জড়িয়ে দেয়া জায়েয নয়। যেহেতু এর দ্বারা এসবের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। কারণ কুরআনের সাথে অপবিত্র নাপাক বস্তুর মিশ্রণ হারাম। আর কয়েকদিনের ব্যবধানেই মৃতের লাশের গলিতাংশ কুরআনের সাথে অবশ্যই জড়িয়ে যাবে। অনুরূপ বিভিন্ন দোয়া এবং স্থানে স্থানে আল্লাহ ও রাসূলের নামসম্বলিত কিতাবাদিও সম্মানযোগ্য। এ সবের শব্দ-বর্ণ অবশ্যই সম্মানের পাত্র। এমনকি জ্ঞান লাভের মাধ্যম হেতু সাদা কাগজও সম্মানের পাত্র। কোন কোন লোক সাদা কাগজে ফেরআউন-হামানের নাম লিখে তাতে জুতাপেটা করে। এটা অত্যন্ত গর্হিত আচরণ। তাদের তো নাগাল পেল না, শব্দের অসম্মান দ্বারাই বীরত্ব দেখানো হলো। মোটকথা, এত সব সত্ত্বেও পুণ্য স্মৃতিকে নির্ধারিত ঈদে পরিণত করা কোন বৈধ কাজ নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো—মহানবী (সা)-এর নিদর্শন বলেই এ সবের মর্যাদা। তাহলে হুকুমও তো তাঁরই নির্দেশ। একেও সম্মান দিতে হবে। এর মধ্যেও যে বরকত রয়েছে, তা অর্জন করা জরুরী। আলোচ্য রেওয়ায়েতসমূহের অন্তরালে "পুণ্যাত্মাগণের স্মৃতিচিহ্নের সাথে আচরণের রূপরেখা কি ধরনের ছিল ?" এ প্রশ্নের সমাধান নিহিত রয়েছে। এতে সীমা অতিক্রম না করে তদনুযায়ী আমাদের আমল করা কর্তব্য। কোন কোন লোক কোর্তা মুবারকের নামে মানত দ্বারা সীমালংঘনে প্রবৃত্ত হয়। অথচ ফকীহ্গণ এটাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কারণ মানত করা ইবাদত। আর সৃষ্টের অনুকূলে ইবাদত নিষিদ্ধ। ইবাদত একমাত্র আল্লারহ্ই জন্য নিবেদিত হতে হবে। বাহ্রুর রায়েক গ্রন্থে সৃষ্টের নামে মানত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা এক জঘন্যতম হারাম, যা কার্যকর করা ওয়াজিব নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে মানতের জিনিস গ্রহণ করা, খাওয়া এবং তাতে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা অবৈধ ও নাজায়েয বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

—ওয়ায-আল্-হুবুর, পৃষ্ঠা ২১

দুই ঃ স্মৃতিচিহ্নের ভরসায় কারো পক্ষে আমল ত্যাগ করা আদৌ উচিত নয়। ঈমান ব্যতীত এ সবই অর্থহীন। সুতরাং লক্ষণীয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট বহু নিদর্শন জমা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় কোর্তা মুবারক তার কাফনে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। এটা কার ভাগ্যে জোটে। আজকাল বড়জোর গিলাফে কা'বার টুকরা দেয়া যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্র জামার সাথে এটির কোন তুলনা চলে না। তাঁর শরীর মুবারক আরশ ও কাবা অপেক্ষা আফযল বা সম্মানিত। গিলাফে কা'বাকে

মহানবী (সা)-এর কোর্তার সমতুল্য ধরে নিলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থুথুর পরশ পায় এমন বরাত কয়জনের। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র মুখের থুথু তার মুখে লাগিয়েছিলেন। অথচ এটা ছিল দেহের অংশ যার বরকত পোশাক অপেক্ষা অধিক। অধিকন্তু তিনি তার জানাযার নামায পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন যা ছিল তার অনুকূলে দোয়ার নামান্তর। অতএব আজকাল এহেন ভাগ্য কারই বা জোটে যে, সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে স্বয়ং মহানবী (সা) জানাযা পড়াবেন। কিন্তু এতসব নবুয়তী স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কোন উপকার সাধিত হয়নি। কারণ সে ছিল ঈমান বঞ্চিত, বে-ঈমান। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র স্পষ্ট ঘোষণা হলো—انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون

—এসব মুনাফিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে নিশ্চিত কুফরী করেছে আর ফাসিক অবস্থায়ই এরা মৃত্যুবরণ করেছে। —আর রফউ ওয়াল-ওযউ, পৃষ্ঠা ৩০

প্রশ্ন ঃ ২১. রমযানের আগমন প্রতীক্ষায় সৎকাজ মুলতবি রাখা বিদ'আত।

কেউ কেউ রমযানের অপেক্ষায় কোন কোন পুণ্য কাজ মুলতবি রাখে। যেমন শাবান মাসে একজনের যাকাতবর্ষ পূর্ণ হলো কিন্তু রমযানের অপেক্ষায় সে আদায় করবে না। রমযান মাস আসা পর্যন্ত তার টাকা নষ্ট হয়ে যাক, চুরি হোক অথবা পথের ফকীর হয়ে যাক কিন্তু যাকাত দিতে হবে রমযানেই। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখতে হবে—মহানবী (সা) কর্তৃক রমযান মাসে আমল করার উৎসাহদানের অর্থ এই নয় যে, রমযানের অপেক্ষায় অন্যান্য নেক কাজ বন্ধ রাখতে হবে। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—রমযানের পূর্বে কারো কোন কাজ করণীয় ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশত সুযোগের অভাবে সে কাজ সমাধা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, এখন রমযানের ভিতর যেভাবেই হোক তা যেন সমাধা করা হয়। সুতরাং তাঁর মূল বক্তব্য হলো—নেক কাজে বিলম্ব ঘটিয়ে পবিত্র রমযান মাস পার করে দেয়া থেকে বারণ করা, রমযানের পূর্বে করণীয় কাজ সমাধা করা থেকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। এ-দুইয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। কিন্তু অল্প বুদ্ধির কারণে উক্ত বক্তব্যের মর্মফল এই হয়েছে যে, রমযান মাসে খরচ করার ফযীলত ও সওয়াবের কথা শুনে এর অপেক্ষায় পূর্ব-করণীয় সৎকাজ বন্ধ রাখা হয়। খুব ভাল করে বুঝুন যে, নেক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করাতে অধিক সওয়াব। আর তা এত অধিক যে, রমযান-পূর্ব কাজের সওয়াব মধ্য-রমযানের তুলনায় পরিমাণে যদিও অল্প কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, মানগত দিক দিয়ে এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে সে পূর্বকাজ অতি উত্তম এবং রমযানের কাজ অপেক্ষা তার সওয়াব উচ্চতর মানসম্পন্ন। প্রশান্ত চিত্তে, দিব্য জ্ঞানে

আমি এ বক্তব্য রাখছি আর কসম অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানকারী এবং জোরালো কোন ভাষা আমার জানা নেই। কে বলতে পারে যে, শাবান মাসে কোন অভাবীর হাতে যাকাতের টাকা তুলে দিলে তার অন্তর থেকে এমন দোয়া হয়তো উচ্চারিত হতো যার সামনে সত্তর রমযান তুচ্ছ। এ রহস্যটাই মানুষের অজ্ঞাত। উল্লেখ্য, যাকাতের বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তা আদায়ে বিলম্বের কারণে গুনাহ হবে কি-না এ সম্পর্কে ফকীহ্গণের মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে যাকাত অবিলম্বে আদায়যোগ্য—তাৎক্ষণিক ওয়াজিব। তাঁরা বিলম্বে আদায়ে গুনাহ্ হওয়ার পক্ষপাতী। কেউ কেউ বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব নয়। তাই তাঁদের মতে বিলম্বে আদায় করাতে গুনাহ হবে না। সুতরাং ওয়াজিব হওয়ার পর অবিলম্বে আদায় করাতেই অধিক সতর্কতা। সর্বসম্মতিক্রমে এটাই গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। বলা বহুল্য, রমযানের অপেক্ষায় দান-খয়রাত বন্ধ রাখা সওয়াবের বিষয় হলে শরীয়ত অন্তত কোথাও এ কথার ঘোষণা দিত যে, রমযানের এতদিন পূর্ব থেকে সমস্ত দান-খয়রাত বন্ধ রাখতে হবে। কাজেই শরীয়ত যেহেতু এ ধরনের নির্দেশ শোনায়নি সে ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে এরূপ করাটা দীনের ওপর অতিরঞ্জন এবং বিদ'আত। কেননা শরীয়ত যে কাজে সওয়াবের আশ্বাস দেয়নি আপনারা সেটাকে সওয়াবের কাজ মনে করে পালন করছেন। বস্তুত এটা শরীয়তী হুকুমের বিরোধিতারই নামান্তর। কিন্তু এতদিন বিষয়টা জানা ছিল না বলে সম্ভবত গুনাহগার হবে না। কিন্তু স্পষ্ট হওয়ার পর এখন এ ধরনের কাজে গুনাহ্ হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

–তাকলীলুল মানাম, পৃষ্ঠা ৩০

প্রশ্ন ঃ ২২. চার দলীলের ভিত্তিতে মিলাদুন্নবী উৎসবের অসারতা প্রমাণ, এর উদ্ভাবকদের দলীলের জবাব।

জানা দরকার "ঈদে মিলাদুন্নবী" নামে প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে দু'ধরনের কথা রয়েছে। (এক) এটা শরীয়তসম্মত না হওয়া সম্পর্কিত প্রমাণ। (দুই) বিরুদ্ধবাদীদের পেশকৃত দলীলের জবাব। অতঃপর শুনে রাখুন যে, শরীয়তের দলীল চারটি। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। ইনশাআল্লাহ পর্যায়ক্রমে এ চারটি সম্পর্কেই এখন আলোচনা করা হবে। প্রথমত কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ প্রশ্নাকারে উল্লেখ করেছেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ -

—তাদের উপাস্যদের কি অধিকার রয়েছে যে, তাদের ধর্মের এমন বিষয় তারা সাব্যস্ত করে দেবে, আল্লাহ্ যার অনুমতি দেননি ?

আলোচ্য আয়াত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ্র হুকুম তথা-শরীয়তের প্রমাণ ছাড়া দীনি কোন বিষয় নিজের পক্ষ থেকে নিরূপণ করা বা প্রবর্তন করা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। এই হলো বক্তব্যের প্রথম অংশ। দ্বিতীয় কথা হলো—ঈদে মিলাদুন্নবী দীনি কাজ মনে করে বিনা দলীলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা শরীয়তসম্মত বিষয় নয়। বরং নব উদ্ভাবিত। আংশিকভাবে এর ভিত্তিহীনতা তো সুস্পষ্ট। আর বৈধতার কোন সম্ভাবনা যদি থাকেও তবে এতটুকুই যে, সম্ভবত একে তারা কোন সামষ্টিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করবে যার ব্যাখ্যা পরে বর্ণিত হবে। তবে মোটামুটি এতটুকু জানা দরকার যে, এর উপলক্ষ বা কারণ পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। চাই সেটা আনন্দ প্রকাশ হোক অথবা ইসলামের শক্তি প্রদর্শন। যাই হোক আমাদের কথা হলো—মহানবী এবং সাহাবীগণের স্বর্ণযুগেও এ উপলক্ষ বিদ্যমান ছিল। আর তাঁরা কুরআন-হাদীসের মর্ম উত্তমরূপে অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন, যার কারণে বর্তমানকালে এর ওপর ইজতিহাদ বৈধ রাখা হয়নি। অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আনন্দ প্রকাশ কিংবা ইসলামের শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন তীব্র থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এর ওপর আমল করেননি। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, এটা ভিত্তিহীন, বিদ'আত ও বানোয়াট বিষয় মাত্র। শরীয়তসিদ্ধ নয় এমন বিষয়কে দীনি কাজ মনে করাটাই মূলত বিদ'আত। কাজেই এটাকে বর্জন করা ওয়াজিব। এ তো গেল কুরআনভিত্তিক আলোচনা।

এখন হাদীসের প্রমাণ লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

—যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা বর্জনীয়।

এখানেও উক্ত আয়াতের অনুরূপ একই বক্তব্য। নব আবিষ্কৃত বিষয়ের মর্ম হলো—যার উপলক্ষ প্রাচীন কিন্তু তখন আমল করা হয়নি। পক্ষান্তরে যে বিষয়ের কারণ নতুন এবং শরীয়তের অপরাপর আদিষ্ট বিষয় তার ওপর নির্ভরশীল সেটা দীনের অন্তর্ভুক্ত এবং আমল করা ওয়াজিব। দ্বিতীয় হাদীস ঃ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختصوا الليلة الجمعة بقيام من بين الليالى
ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون فى يوم يصومه احدكم -

—মহানবী (সা) বলেছেন—জুমআর রাতকে তোমরা অন্যান্য রাত হতে (নফল ইবাদতের নিমিত্ত) জাগরণের জন্য নির্দিষ্ট করো না আর জুমআর দিনকে তোমরা রোযার জন্য অন্যান্য দিন থেকে নির্দিষ্ট করো না, অবশ্য তোমাদের কারো সেদিন রোযা রাখার অভ্যাস থাকলে ভিন্ন কথা।

এ হাদীসের আলোকে নীতিমালা প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তসিদ্ধ নয় এমন বিষয় নির্দিষ্ট করা নিষিদ্ধ। অবশ্য শুক্রবারে রোযা রাখা কিরূপ সেটা ভিন্ন কথা। আলিমগণ অন্য এক দলীলের ভিত্তিতে এর বৈধতার হুকুম আর নিষেধকে সাময়িক আখ্যা দিয়েছেন যে, রোযার কারণে শুক্রবারের অন্যান্য করণীয় আমল সম্পাদনে যেন দুর্বল না হয়ে পড়ে। এ তো গেল প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূলনীতি নির্ধারণ করাই ছিল আমাদের আসল উদ্দেশ্য, যাতে শুক্রবারে রোযা রাখার সমর্থকদেরও উক্ত মূলনীতির বৈধতার ওপর কোন আপত্তি না থাকে। অতএব "শরীয়তসম্মত নয় এমন বিষয় দীনের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করা জায়েয নয়"—এ নীতিমালা সর্বসম্মত ও বৈধ। এখন এ মূলনীতি স্বীকার করার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মদিন পালনের নির্দিষ্ট প্রথার স্বরূপ কি ধরনের লক্ষ করুন। বলা বাহুল্য, নবী দিবস পালন করা শরীয়ত কিংবা স্বভাব কোন বিধিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ দীনি কাজ মনে করেই তা পালন করা হয়। আর এতে সম্মতি নেই এমন লোকদেরকে বেদীন আখ্যা দেয়া হয়। সমাজে তারা নিন্দার পাত্র। অথচ সামাজিক রীতি ও রুচি বিরোধী কোন কাজে কেউ নিন্দা কিংবা সমালোচনার পাত্র চিহ্নিত হয় না। কথাটা স্পষ্ট করে বলি। মনে করুন, এক ব্যক্তি মলমল ব্যবহারে অভ্যস্ত। পরবর্তী সময়ে সে তা বর্জন করলে কেউ তার নিন্দায় নাক গলায় না কিংবা সমাজে সে নিন্দিত ব্যক্তি নয়। কাজেই বোঝা গেল এভাবে মিলাদুন্নবীর তারিখ ও অনুষ্ঠানমালা নির্ধারণ করাটা শরীয়তসম্মত নয়। বরং এক্ষেত্রে চিন্তার গভীরে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়—তুলনীয় শুক্রবার অপেক্ষা প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান অধিকতর অসিদ্ধ। কারণ শুক্রবারের ফযীলত সুস্পষ্ট হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু জন্ম দিবস সম্পর্কে তাও নেই। অবশ্য জন্ম দিবসের বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে সারা মুসলিম জাহান বিশ্বাসী। সুতরাং আল্লামা সুয়ূতী অথবা মোল্লা আলী কারী উক্ত মাসের ফযীলত সম্পর্কে বলেছেন ঃ

هذا لشهر فى الاسلام فضل
ومنقبة تفوق على الشهور
ربيع فى ربيع فى ربيع
ونور فوق نور فوق نور

—এটা এমন মাস, অন্যান্য মাস অপেক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে যার মর্যাদা সর্বাধিক। যেন বসন্তের ওপর চির বসন্তকাল এবং আলোর ওপর উজ্জ্বল আলো, তার ওপর আলোকমালার তরঙ্গ বিচ্ছুরণ।

এর সাথে আমার সংযোজন ঃ

ظهور فى ظهور فى ظهور
سرور فى سرور فى سرور

—অধিকন্তু এ মাস যেন প্রকাশের ওপর বিকাশ, তারো ওপর উদ্ভাসন এবং আনন্দের মধ্যে অধিক উল্লাস, তার মধ্যে খুশীর প্লাবন।

মোটকথা, জন্ম দিবসের মূল বরকত ও ফযীলত অনস্বীকার্য। কিন্তু কথা হলো—শুক্রবারের ন্যায় যেহেতু এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন হাদীস নেই কাজেই এ নির্ধারণ অবৈধ হবে না কেন ? কেউ কেউ দাবি করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম দিবসের ফযীলত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং বর্ণিত হয়েছে—মহানবী (সা) সোমবার দিন রোযা রাখতেন। কেউ প্রশ্ন করল—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সোমবারে রোযা রাখার কারণ কি ? বললেন ঃ ولدت يوم الاثنين "আমি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছি।" এর জবাব পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় হাদীস শুনুন, যা নাসাই শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على فان صلوتكم تبلغنى حيث كنتم -

—রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার কবরকে তোমরা ঈদ-উৎসবে পরিণত করো না। আর তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠাও। কেননা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছবেই।

আলোচ্য হাদীসে বে-ঈদকে উৎসবে রূপান্তরিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারো মনে হয়তো সন্দেহ জাগতে পারে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরে তো সবাই একত্রিত হয় ? এর জবাব হলো—মূলত হাদীসের মর্ম এই যে, আমার কবরে তোমরা ঈদ সমাবেশের ন্যায় নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করে একত্রিত হয়ো না। উল্লেখ্য, ঈদ উৎসবে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখে এবং এর জন্য পরস্পর আমন্ত্রণ জানিয়ে জনসমাবেশ ঘটানো হয়। বস্তুত মিলাদুন্নবীর উদ্দেশ্যে এ ধরনের নিমন্ত্রিত সমাবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন ব্যবস্থাপনা ছাড়া ঘটনাক্রমে একত্রিত হয়ে যাওয়া

নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং দেখা যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওযা পাকের যিয়ারতে নির্দিষ্ট দিন কিংবা বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নয় বরং প্রত্যেকেই সুবিধামত সময়ে উপস্থিত হয় এবং কাজ সমাধা করে চলে আসে। অতএব রওযা পাকে তথাকথিত গণজমায়েত নাজায়েয উক্ত হাদীস তারই স্পষ্ট প্রমাণবাহী। কাজেই স্থানগত উৎসবের ন্যায় কালগত উৎসবও নিষিদ্ধ হবে। অধিকন্তু صلوا على فان صلوتكم تبلغنى حيث كنتم (তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠাও। যেখানেই তোমরা থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছবেই।) বাক্যাংশ সংযোজন করা হলে সমাবেশের অবৈধতা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। কেননা فان صلوتكم বাক্যটি দৃশ্যত এরি প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে, ঘটা করে তোমাদের এতসব আয়োজন-অনুষ্ঠানসর্বস্ব মিলাদের দরকার কি ? তোমাদের কাজ দরূদ পাঠানো, তা যেখান থেকেই পাঠাওনা কেন আমার নিকট তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা আগেই করা আছে, তোমাদের ভাবতে হবে না। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমার মতে বিশুদ্ধতর বিশ্লেষণ এই যে, ইতিপূর্বে উল্লিখিত لا تجعلوا বাক্যের আশ্রয়ে বিদ'আতীরা একটা অজুহাত খাড়া করতে পারত যে, আমরা তো দরূদের উদ্দেশ্যে রওযা পাকে একত্রিত হয়ে থাকি। আর দরূদ শরীয়তের একটি নির্দেশিত বিষয়। কাজেই আমাদের সমাবেশ জায়েয ও বৈধ। সুতরাং মহানবী (সা) নিজেই তাদের এ সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে বলেন ঃ মদীনায় উপস্থিতির ওপর দরূদের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল নয়। বরং বিশ্বের যেকোন অংশে তোমরা পাঠ কর আমার নিকট তা পৌঁছবেই। কাজেই তাদের এ-বাহানা অসার, ভিত্তিহীন। এর দ্বারা অপর একটি বিষয় উদ্ভাবিত হয় যে, দরূদ ফরয, ওয়াজিব ও নফল যে ধরনেরই হোক না কেন এর কোনটির জন্যই উৎসবের ন্যায় একত্রিত হওয়া জায়েয নয়, সেক্ষেত্রে অন্য কোন উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া কিরূপে জায়েয হবে? কিন্তু এর দ্বারা কারো সন্দেহ হওয়া উচিত নয় যে, রওযা পাকের যিয়ারতে যাওয়াও বোধ হয় বৈধ নয়। কেননা শুধু দরূদ পাঠের জন্য সেখানে কেউ হাযির হয় না বরং রওযা পাকের যিয়ারত করাই মুখ্য বিষয়। আর কবর ছাড়া অন্য কোথাও যিয়ারত সম্ভব নয়।

এ সম্পর্কিত চতুর্থ হাদীস হলো—কোন এক ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতিতেই কয়েকটি বালিকা খেলায় মগ্ন ছিল। হযরত উমর (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ধমক দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا

—"হে উমর! এদের নিষেধ করো না, প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট ঈদ বা উৎসব রয়েছে আর এটা হলো আমাদের ঈদ।" আলোচ্য হাদীসে ঈদকে খেলার বৈধতার কারণ নির্ধারণ করার ভিত্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তা কেবল উক্ত দিনের সাথে সম্পৃক্ত। তাহলে এখন প্রত্যেকের জন্যই যদি উৎসব করা বৈধ সাব্যস্ত করা হয়, তবে প্রতিদিন এ জাতীয় খেলা জায়েয হয়ে যায় এবং তাতে হাদীসের নির্দিষ্টতা বাতিল সাব্যস্ত হয়ে উদ্ভাবিত বিষয় প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু আমাদের এ দাবি ইজমা দ্বারাও প্রমাণিত। এর ব্যাখ্যা হলো—কোন বিষয় বর্জন করার ওপর গোটা উম্মত একমত হয়ে গেলে উক্ত বিষয় নাজায়েয হওয়ার পক্ষে সেটাই ইজমা। তাই ফকীহ্গণ স্থানে স্থানে দলীল পেশ করেছেন যে, সাহাবীগণ মহানবী (সা)-এর কোন কাজ সর্বদা বর্জন করাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। যেমন তিনি বিনা আযানে সর্বদা ঈদের নামায পড়েছেন। তদ্রূপ সকল উম্মত কর্তৃক বর্জিত কোন কাজ বর্জন করা ওয়াজিব। এ মূলনীতি স্বীকৃত না হলে আজ থেকে ঈদের নামাযে আযান-ইকামত সংযোজন করে দেয়া উচিত। আর স্বীকৃত হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, সমস্ত উম্মত কর্তৃক ঈদে মিলাদুন্নবী বর্জিত হয়নি, যেহেতু আমরাও উম্মত আর আমরা তা পালন করি। তাই ইজমা হলো কোথায় ? এর উত্তরে বলা যায়—ফিকাহ শাস্ত্রের স্বীকৃত নীতি এই যে, পরবর্তিগণের মতভেদ পূর্ববর্তিগণের ঐকমত্য বিনষ্টকারী নয়। স্পষ্ট কথায়–যে বিষয়টি পূর্ববর্তী সময়ের ঐকমত্য সমৃদ্ধ, পরবর্তীকালের মতবিরোধ তা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। সুতরাং আপনাদের সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত উম্মত কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মোৎসব পালন-প্রথা বর্জিত ছিল। এখন সে ঐকমত্য ক্ষুণ্ন হতে পারে না। হানাফী আলিমগণ কর্তৃক জানাযা নামাযের পুনরাবৃত্তি নাজায়েয ফতোয়া দান এ মূলনীতিরই নিঃসৃত ফল। দলীল একই যে, এটা সাহাবা ও তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রমাণিত নয়। মোটকথা, সমস্ত উম্মতের বিবর্জন কোন বিষয় নাজায়েয হওয়ার দলীল। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, উক্ত জন্মোৎসব নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। সুতরাং অবশ্য বর্জনীয়।

এখন বাকি রইল কিয়াস। বস্তুত কিয়াস দুই প্রকার। (১) মুজতাহিদ হতে বর্ণিত এবং (২) বর্ণিত নয়। এক্ষেত্রে নীতি হলো—মুজতাহিদের সমসাময়িক কোন বিষয়ে গায়র মুজতাহিদের কিয়াস গ্রহণীয় নয়। অবশ্য পরবর্তীকালের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে গায়ের মুজতাহিদের কিয়াস গ্রহণযোগ্য বটে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পদ্ধতি এবং আধুনিক যুগের উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধান কিয়াসের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হবে।

অতএব আলোচ্য মিলাদের ব্যাপারে আমরা নিজেরা কিয়াসকামী নই। কেননা পূর্ববর্তিগণের রায়ের সাথে বিরোধ না হওয়া অবস্থায়ই কেবল আমাদের কিয়াসের যথার্থতা থাকতে পারে, বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নয়। সুতরাং 'তাবঈদুশ্ শাইতান' ও 'সিরাতে মুসতাকীম' নামক পুস্তকদ্বয়ে এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোন 'সময়' বা 'স্থানকে' উৎসবে পরিণত করা নিষিদ্ধ। সুতরাং কিয়াস দ্বারাও উক্ত উৎসব না-জায়েয প্রমাণিত হয়। এসব তো হলো আমাদের পক্ষের দলীল। এখন উৎসবপন্থীদের দলীলের তফসীল এবং তার জবাব শুনুন। উল্লেখ্য, সম্ভবত নিজেদের সপক্ষে তারা এসব দলীল পেশ করতে পারে। অবশ্য তাদের সাথে সম্পৃক্ত এসব প্রমাণ কোথাও আমার নযরে পড়েনি এবং বছরের পর বছর চেষ্টা করলে এর একটি প্রমাণ তাদের পক্ষে দাঁড় করানো সম্ভবও নয়। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সপক্ষ দলীল আমিই ব্যক্ত করছি, যেন এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে কারো কিছু বলার অবকাশ খতম হয়ে যায়।

প্রথমত, قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا (অর্থাৎ বল, আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ এটা, এরি জন্য তাদের আনন্দ প্রকাশ বাঞ্ছনীয়) আয়াতকে ভিত্তি করে তারা বলতে পারে যে, এর আলোকে আনন্দ প্রকাশ করা কুরআন-নির্দেশিত বিষয়। আর জন্মোৎসবও মূলত তাই, কাজেই এটা জায়েয। জবাব পরিষ্কার যে, আয়াত দ্বারা কেবল আনন্দ প্রকাশের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনা ছিল মূলত উদ্ভাবিত সে প্রথাকেন্দ্রিক মিলাদানুষ্ঠান যার সাথে আয়াতের কোন ছোঁয়া নেই। তদুপরি এ প্রথাকে সে মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করার বৈধতা সাপেক্ষে ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে যেসব বিদ'আত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেগুলোও এ জাতীয়। কোন না কোন মূলনীতির অধীনেই এসব অনুষ্ঠান জায়েয হওয়া উচিত। অথচ উভয় পক্ষের স্বীকৃত ফিকাহ গ্রন্থে এসবের স্পষ্ট নিষেধ বর্ণিত রয়েছে। বক্রপথের অনুসারীরা সর্বদা এহেন প্রতারণা কিংবা অজ্ঞতার শিকার হয়ে আছে যে, আমাদের এবং হকপন্থীদের ঝগড়া ও বিরোধের বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা হকপন্থীদের বিপক্ষে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আপত্তি উত্থাপন করে। এখানেও তাই হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত একটি বিশেষ প্রথা বা পন্থাকেই আমরা নাজায়েয বলে থাকি। আর فليفرحوا আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণিত আনন্দ শর্তহীন। তাই তারা মনে করে আমরা শর্তহীন আনন্দমাত্রই নিষেধ করে থাকি। অথচ এ ধারণা ভুল। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তার আলোকে দেখা যাবে আমরাই বরং উক্ত আনন্দ অধিক পরিমাণে প্রকাশ করে থাকি। কেননা উক্ত আবিষ্কারক মহল বছরে মাত্র একবারই এ

উৎসবের আয়োজনে মেতে ওঠে আর অবশিষ্ট সারা বছর তারা নীরব। পক্ষান্তরে আমাদের খুশি অব্যাহত ধারায় সারাক্ষণ চলতেই থাকে (কেননা নিসবতপন্থী তথা আল্লাহ্র সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তারা ঈমানের দীপ্তি ও স্বাদে প্রতি মুহূর্তে আনন্দে বিভোর থাকেন)। তাদেরই অনেকে এ সম্পদে সমৃদ্ধ।

وذالك فضل الله يوتيه من يشاء وهذا هو الفرح انما موربه كما مر فى تفسير الاية

—এটা আল্লাহ্রই অপার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। এটাই সে নির্দেশিত আনন্দ যা আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। (সংকলক)

অতএব যারা সারা বছর মুলতবি করে দেয় বাস্তবে তারাই আয়াতের ওপর কর্মবিমুখ। আমরা এতে বিরতি না দিয়ে আল্লাহ্র অনুগ্রহে আয়াতের ওপরও আমল করি, অপরদিকে নিষিদ্ধ বিদ'আত থেকেও বেঁচে থাকি। বিদ'আতীরা উভয় কূল হারায়।

সার কথা—নির্দেশিত আনন্দ তিন ধরনের। (১) ইফরাত, (২) তাফরীত ও (৩) ই'তিদাল। তাফরীত হলো—কেবল নির্দিষ্ট সময়ে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা সংকীর্ণমনাদের কাজ। আর ইফরাত বলা হয়–শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে দ্রুত আনন্দে মেতে ওঠা যা তথাকথিত প্রগতিবাদীদের চরিত্রের লক্ষণ। অতঃপর ই'তিদাল অর্থাৎ মধ্যপন্থা যা সংকীর্ণ বা অতিক্রম উভয়টির মাঝপথে অবস্থিত। আল্লাহ্র শোকর যে, আমরা এরি অনুসরণ করে থাকি।

বিপক্ষীয়দের দ্বিতীয় দলীল হতে পারে এ হাদীস, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে উল্লসিত আবূ লাহাব নিজের বাঁদীকে আজাদ ঘোষণা করে দেয়। ফলে তার আযাবের মাত্রা হ্রাস করা হয়। সুতরাং বোঝা গেল মহানবী (সা)-এর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা জায়েয এবং বরকতময় বিষয়। এরও একই জবাব যে, আমরা শর্তহীন আনন্দের পক্ষপাতী এবং সর্বদা এরি ওপর আমল করে থাকি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল নির্দিষ্ট প্রথা ও পন্থাকেন্দ্রিক আলোচনা। তৃতীয়ত তাদের দলীল আরো হতে পারে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে—

وَ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ الى قوله رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ -

—(অর্থাৎ স্মরণযোগ্য সে সময়টি যখন হাওয়ারীরা বলল—হে মরিয়ম-পুত্র

ঈসা! আপনার রবের পক্ষে কি সম্ভব যে, আসমান থেকে তিনি আমাদের জন্য খাদ্য পাঠাবেন ?) হতে হযরত ঈসা (আ)-এর দোয়া (হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের খুশি এবং আপনার শক্তির নিদর্শনস্বরূপ আকাশ থেকে আমাদের খাবার পাঠিয়ে দিন।) পর্যন্ত আয়াতের আলোকে বোঝা যায় যে, অনুগ্রহপ্রাপ্তির দিনটিতে উৎসব পালন করা জায়েয। আর আমাদের নীতিমালা নির্দিষ্ট রয়েছে যে, বিগত উম্মতগণের শরীয়তে বর্ণিত হওয়ার পর আল্লাহ্ কর্তৃক তা বর্জনের হুকুম ব্যক্ত না হলে সেটা আমাদের অনুকূলে প্রমাণরূপে গণ্য হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কোন নিষেধবাক্য উক্ত না হওয়ায় বোঝা যায় যে, অনুগ্রহ লাভের তারিখে আনন্দ উৎসব করা জায়েয। আর রাসূলুল্লাহ্‌র জন্ম নিঃসন্দেহে বৃহত্তর অনুগ্রহ। কাজেই তাঁর জন্ম দিবসে আনন্দ উৎসব বৈধ হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এর জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত ঘটনাস্থলেই এর অস্বীকৃতি অনিবার্য নয়। লক্ষ করুন وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ (অর্থাৎ স্মরণযোগ্য সে সময় যখন ফেরেশতাগণকে আমি নির্দেশ দিলাম আদমকে সিজদা করার।) আয়াতে তা'যীমী তথা সম্মানসূচক সিজদার উল্লেখ রয়েছে। অথচ আমাদের শরীয়তে তা নিষিদ্ধ। তার অস্বীকৃতি এখানে বর্ণিত নেই, কিন্তু অন্যত্র এর দলীল রয়েছে। তদ্রূপ এখানেও লক্ষ করুন, উৎসবের পরিপন্থী আমাদের উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস এর অবৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রণিধানযোগ্য, দলীলদাতা কর্তৃক আয়াতের মর্মার্থ স্বীকার করা সাপেক্ষে এ উত্তর। নতুবা আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণ হয় না যে, খাদ্য নাযিলের দিনটিকে উৎসব দিবসে পরিণত করাই ঈসা (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল। কেননা تكون বাক্যের ضمير তথা সর্বনাম مائده-এর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী। তাই এর দ্বারা "খাদ্য নাযিল হওয়ার দিবস" অর্থ করা রূপক অর্থ। আর নিয়ম হলো—শব্দের বা বাক্যের মূল অর্থ যে পর্যন্ত প্রয়োগ করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে রূপক অর্থের আশ্রয় নেয়া সমীচীন নয়। সুতরাং অর্থ হবে تكون المائدة سرورا لنا অর্থাৎ, "সে 'খাদ্য' যেন আমাদের আনন্দের কারণ হয়।" বস্তুত 'ঈদ' শব্দের প্রয়োগ এখানে প্রচলিত অর্থে করা হয়েছে, এটা স্বীকৃত নয় বরং 'ঈদ' শব্দ শর্তহীন আনন্দ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কোথাও ঈদ শব্দের প্রয়োগ হলেই তার অর্থ "ঈদে মিলাদুন্নবীই" হবে এমন কোন কথা তো নেই। শী'আরা যেরূপ কোথাও ع - ت - م এর প্রয়োগ দেখামাত্রই متعه (সাময়িক বিয়ে) প্রমাণে তৎপর হয়ে ওঠে। তাই শেখ সা'দীর ছন্দ

ربنا استمتع بعضنا تمتع زهر گوشه یافتم (সবদিক থেকে আমি সফল হয়েছি) এবং ببعض (হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের সহায়তা লাভ করেছি) আয়াতের অন্তরালে তারা কেবল মুত'আর অর্থই দেখতে পায়। অনুরূপ মিলাদপন্থীদের নিকট কোন স্থানে ع - د - ى উল্লিখিত হলেই তার অর্থ ঈদে মিলাদুন্নবীর বৈধতা প্রমাণ হয়ে যায়। অপর একটি ঘটনা দ্বারা তাদের চতুর্থ দলীল হতে পারে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

اليوم اكملت لكم دينكم

—(আজ তোমাদের দীনকে আমি পূর্ণতা দান করলাম) আয়াত নাযিলের পর জনৈক ইহুদী হযরত উমর (রা)-কে লক্ষ করে বলল ঃ এ আয়াত আমাদের ওপর নাযিল হলে অবতরণের সে দিনটিকে আমরা 'ঈদ' তথা উৎসব দিবসে পরিণত করতাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ উক্ত আয়াত নাযিল ঈদের দিনই হয়েছে। অর্থাৎ জুম'আ ও আরাফার দিন। উক্ত আয়াতের তাফসীর তিরমিযীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ জুম'আ এবং আরাফার দিন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের আলোকে তাদের বক্তব্য এই যে, হযরত উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) উৎসব অস্বীকার করেননি। তাই বোঝা গেল অনুগ্রহ লাভের তারিখকে উৎসবে পরিণত করা জায়েয। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পক্ষে এ দলীল সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আমি শুধু অনুগ্রহবশে তাদের হয়ে এ দলীল পেশ করেছি যে, এর ভিত্তিতে তাদেরও কিছু বলার অবকাশ ছিল। দু-ধরনের জবাব হতে পারে এর। প্রথমত জবাব এই যে, তাঁদের অস্বীকার এখানেই বর্ণিত থাকবে এটা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং ফকীহগণ হাজীদের অনুকরণে আরাফার দিনে অন্য কোথাও একত্রিত হওয়া অবৈধ ঘোষণা করেছেন। অথচ তাঁদের এ রায় অন্যত্র বর্ণিত রয়েছে। এখানে বর্ণিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তদুপরি ইবনে আব্বাস (রা) তাহ্সীব (تحصيب) তথা 'কাঁকর বিছানোকে ليس بشئ অর্থাৎ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ এটা বর্ণিতও রয়েছে। তা সত্ত্বেও নিছক আদত-অভ্যাসকে ইবাদতে রূপ দেয়ার কারণেই তাঁর এ অস্বীকৃতি। এমতাবস্থায় গায়র মানকুল তথা বর্ণিত নয় এমন বিষয়কে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় কল্পনা করা তো তাঁর পক্ষ থেকে অস্বীকার করাই হবে। উপরন্তু উমর (রা) কর্তৃক হুদাইবিয়ার বৃক্ষতলে জমায়েত হওয়ার অস্বীকৃতি সুপ্রসিদ্ধ। যথাস্থানে অস্বীকৃতি বর্ণিত না থাকা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর ওপর তাঁদের উভয়ের অস্বীকৃতি প্রমাণিত রয়েছে। দ্বিতীয় জবাব এই যে, সে ব্যক্তি মুসলমান

ছিল না, ছিল ইহুদী। তার উক্তির পাল্টা জবাবে হযরত উমর (রা) বলেছেন যে, নতুন ঈদের প্রয়োজন কি, আমাদের ঈদ বা আনন্দ উৎসবের বন্দোবস্ত তো পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। বস্তুত তাঁর জবাবের ভঙ্গিতেই প্রতীয়মান হয় যে, এ দিনটিকে উৎসবে পরিণত করা জায়েয নয়। হযরত উমর (রা)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমাদের শরীয়ত যেহেতু এ উৎসবের বৈধতা সমর্থন করেনি, তাই আমরা নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং অন্যভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই আমাদের আনন্দের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

অপর একটি হাদীসকে তারা পঞ্চম দলীল হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। হাদীসটি হলো—মহানবী (সা) সোমবার রোযা রাখলে কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তিনি বললেন ঃ ذالك اليوم ولدت فيه অর্থাৎ এটা আমার জন্মদিন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ দিনের ইবাদত শরীয়তসম্মত, বৈধ এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়। কাজেই এ উপলক্ষে এ দিনে আনন্দ প্রকাশ করা শরীয়তসম্মত না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এর দু-ধরনের জবাব দেয়া চলে। (১) মহানবী (সা) জন্মদিনের সম্মানেই যে রোযা রেখেছেন আমাদের নিকট এ তথ্য স্বীকৃত নয়। যেহেতু অন্যত্র এর কারণ ব্যক্ত করে বলেছেন—সোমবার-শুক্রবার আমলনামা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বস্তুত আমলই ছিল এ দিনে রোযার মূল উদ্দেশ্য। তাহলে এক্ষেত্রে জন্মদিবসের উল্লেখ অবশ্যই ভিন্ন কোন রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে। অথচ হুকুমের ভিত্তি হলো কারণ, রহস্য নয়। এমতাবস্থায় অন্যান্য নৈকট্যশীল বিষয়কে এর সাথে আপনাদের কিয়াস বা তুলনা করাটা রহস্যকে ভিত্তি সাব্যস্ত করার নামান্তর অথচ এটা স্বীকৃত ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করাও হয় যে, মহানবী (সা)-এর রোযা রাখার কারণ এটাই ছিল, তা সত্ত্বেও এর দ্বারা আপনাদের দাবি প্রমাণ হয় না। কেননা কারণ দু-ধরনের হতে পারে। এক ধরনের কারণ যা সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় প্রকার কারণ ব্যাপকধর্মী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। অতএব, এ কারণ যদি ব্যাপকধর্মী হয়, তবে উক্ত দিবসে কুরআন তিলাওয়াত, গরীবদের খানা খাওয়ানো ইত্যাদি সৎকাজ আপনাদের নিকট গ্রহণীয় নয় কেন? আর এমতাবস্থায় জন্মদিবস সোমবারের মতো ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখেও রোযা রাখা উচিত ছিল। উপরন্তু হিজরত, মক্কা বিজয়, মি'রাজ ইত্যাদির মতো আল্লাহ্র অনুগ্রহ আরো বহু রয়েছে। সে সব কারণের ভিত্তিতে আপনারা অন্য কোন ইবাদতের আশ্রয় না নেয়ার হেতু কি? এর দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, রোযার কারণ এ ক্ষেত্রে ব্যাপক নয়, বরং এরি মধ্যে

সীমাবদ্ধ। সুতরাং অহীই এর মূল ভিত্তি, জন্মদিবসের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক মাত্র। অন্যথায় অন্যান্য অনুগ্রহের দিনও উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে রোযা ও উৎসব বাঞ্ছনীয় ছিল। যদি বলা হয়—যাবতীয় নি'আমত বা অনুগ্রহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মদিবস থেকেই উৎসারিত আর এটাই এসবের মূল ভিত্তি। কাজেই জন্ম ও হিজরতের মধ্যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যগত ব্যবধানের কারণে আনন্দ প্রকাশের সময় ও দিনকাল হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে জন্মদিনকেই। তাহলে আমরা বলব—জন্মের মূল আরো গভীরে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের প্রক্ষেপণ তথা মায়ের গর্ভধারণ করা। তাই এ সময়কেই ভিত্তি করা উচিত। অতঃপর পরিতাপের বিষয় হলো—জন্মদিবস সোমবার মিলাদানুষ্ঠান না করে কেবল ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখেই আনন্দ প্রকাশের সময় ধার্য করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক সোমবারের ইবাদত বর্ণিতও রয়েছে যা জন্ম তারিখের বেলায় অনুপস্থিত। এ হাদীসের মর্ম অনুযায়ী প্রতি সোমবার মিলাদ অনুষ্ঠান করা উচিত। মোটকথা, উক্ত হাদীসবলেও আবিষ্কারকদের দাবি প্রমাণ হয় না। এই ছিল তাদের নকল তথা হাদীস-কুরআনভিত্তিক প্রমাণ।

এ পর্যায়ে এখন আমরা যুক্তিভিত্তিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। কেননা তাদের কেউ কেউ যুক্তিআশ্রয়ীও রয়েছে আলোচ্য ঈদ উৎসবের সমর্থনে তথাকথিত জাতীয় কল্যাণমুখী যুক্তিতে যারা কথা বলে। কাজেই সে আঙ্গিকেই বিষয়টা আমি তুলে ধরতে চাই। জানা দরকার—রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে যে বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন সাথে সাথে সেগুলোর কারণও উল্লেখ করেছেন। সে হিসেবে তাঁর নির্দেশিত বিষয়সমূহ কয়েক প্রকার। প্রথমত, যেসব কারণ বারবার আবর্তিত হয়। সে জন্য আদিষ্ট বিষয়টিও পর্যায়ক্রমে আসতেই থাকে। যেমন নামাযের বাহ্যিক কারণ হলো ওয়াক্ত বা সময়। তাই সময় আসতেই নামায পড়া ওয়াজিব হয়। অনুরূপ রোযার কারণ হলো রমযান মাসের উপস্থিতি। কাজেই রমযানের আগমনে রোযা ওয়াজিব হয়। ঈদের জন্য ফিতর এবং কুরবানীর জন্য কুরবানীর দিনও একই জাতের কারণ। দ্বিতীয়ত, কারণ ও আদিষ্ট বিষয়টি একক। যেমন কা'বাঘরের দর্শন হজ্জ ফরয হওয়ার কারণ। এখানে কারণ যেহেতু একক তাই জীবনে একবারই মাত্র হজ্জ করা ফরয। এ দুই প্রকার কারণই যুক্তিগ্রাহ্য এবং বিবেকসম্মত। সুতরাং বিবেকের দাবিও তাই যে, কারণ একক বা একাধিক হওয়া সাপেক্ষে করণীয় হুকুমটিও এক বা অধিক হোক। তৃতীয় প্রকার এই যে, কারণ তো একই কিন্তু নির্দেশিত বিষয়টি বহু। যেমন হজ্জের তওয়াফে 'রমল' তথা বীরত্ব প্রদর্শনের কারণ ছিল ইসলামের শক্তি প্রদর্শন করা। কিন্তু পরবর্তীতে সে কারণ দূরীভূত হয়ে গেলেও রমলের হুকুম এখনও যথারীতি

বহাল রয়েছে। উল্লেখ্য, রমলের পটভূমিকা হলো—হজ্জের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ মদীনা থেকে মক্কা আগমন করলে তাদের উদ্দেশ করে মুশরিকরা মন্তব্য করেছিল —মদীনার জরা-ব্যাধি এদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। এরি প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে রমল করার অর্থাৎ বাহু দুলিয়ে, বুক টান করে তওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা যেন মুসলমানদের শক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে। এখন সে কারণ তো অবশিষ্ট নেই, কিন্তু রমলের নির্দেশ যথারীতি বহাল রয়েছে কিন্তু বিষয়টি বিবেক বহির্ভূত। আর এ জাতীয় বিষয়ের অনুকূলে অহীর সমর্থন অনিবার্য। এখন আমাদের প্রশ্ন—সে নির্দিষ্ট তারিখ কি গত হয়ে গেছে নাকি ঘুরে ঘুরে আসছে ? বলা বাহুল্য, অবশ্যই তা পেরিয়ে গেছে। কারণ বর্তমানে প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়ালের আগমন ঘটে, কিন্তু এটা হুবহু জন্মদিবস নয়, বরং আসল জন্মদিনের 'অনুরূপ' মাত্র। সুতরাং 'অনুরূপে'র জন্য 'আসলে'র ন্যায় একই হুকুম প্রমাণের পক্ষে বর্ণনামূলক দলীল বিদ্যমান থাকা অনিবার্য। বিবেকগ্রাহ্য না হওয়ার কারণে কিয়াস এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী দলীল সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'আমার জন্মদিন' বলে সোমবার রোযা রাখার কারণ উল্লেখ করেছেন। এতেও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, আসল জন্মদিন তো এখন অতীতের বিষয়, বর্তমানের সোমবার তার 'অনুরূপ' মাত্র। তাহলে এর জন্য আসলের হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার কারণ কি ? এর জবাবে বলা হবে, স্বয়ং অহীর সমর্থনে তিনি এ রোযা রেখেছিলেন, তাই এর ওপর অপরটির তুলনা চলতে পারে না। অতএব, নিছক অনুগ্রহ বশে তাদের সপক্ষে একটি যুক্তিসম্মত প্রমাণ ও তার জবাব ব্যক্ত করার মাধ্যমে আমি বিতর্কিত বিষয়টির আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই। অতএব, এ সম্পর্কে মিলাদপন্থীরা যুক্তির আশ্রয় নিতে পারে যে, এখানে ব্যাপারটা মূলত কিতাবধারী সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলার বিষয় যে, খৃষ্টানরা ঈসা (আ)-এর জন্মদিবসের আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে, তাই এর মুকাবিলায় আমরা মহানবী (সা)-এর জন্মদিনে আনন্দ-উৎসব করে থাকি ইসলামের শক্তি ও সামর্থ্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে। এর উত্তরে আমার কথা হলো—ইসলামে শক্তি প্রদর্শনের অন্য ব্যবস্থা না থাকা অবস্থায় এ যুক্তির যথার্থতা স্বীকৃত ছিল। কিন্তু জুম'আ, দুই ঈদ ইত্যাদি ইসলামসম্মত অনুষ্ঠানে সে অভাব পূরণ করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাদের সাথে প্রতিযোগিতাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিধর্মীদের আচার-অনুষ্ঠানে আরো বহু পালা-পার্বণ যথারীতি চালু রয়েছে, তাহলে এর প্রতিটার মুকাবিলায় তোমাদেরও নতুন নতুন উৎসব পালনের ব্যবস্থা করা উচিত। তদ্রূপ আশুরার দিনে তাযিয়া অনুষ্ঠানও পালন করা বাঞ্ছনীয়, যেন শী'আদের সাথে

মুকাবিলা হয়। কোন কোন মূর্খ নেহায়েত মুকাবিলার খাতিরে এরূপ করেও বসে। আর এতেই যদি কল্যাণ বয়ে আনে, তবে হিন্দুদের হোলী-দেওয়ালী উৎসবও তোমরা শুরু করে দাও। একটি ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে আপনাদের ভিত্তিহীন এ নীতির অসারতা তুলে ধরছি। কোন এক স্থানে 'যাতে আনওয়াত' নামক বৃক্ষে নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাফিররা হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখত। তাদের ধারণায় এর ফলে শত্রুর মুকাবিলায় বিজয় সূচিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার সফরকালে উক্ত বৃক্ষের পাশ দিয়ে গমনকালে সাহাবীগণ আবেদন করলেন—হে রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদের জন্যও এমনি একটি গাছ নির্দিষ্ট করে দিন যাতে আমরাও হাতিয়ার-কাপড় ইত্যাদি ঝুলিয়ে নিতে পারি। লক্ষ করার বিষয় যে, দৃশ্যত বৃক্ষের ডালে হাতিয়ার-কাপড় ইত্যাদি লটকানো দূষণীয় নয়, এতে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যও প্রমাণ হয় না, বৈধ কাজ বলেই ধারণা হয় কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে এ কাজে মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য প্রমাণ হয়ে যায়। সুতরাং মহানবী (সা)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা তো মূসা (আ)-এর নিকট তাঁর কওম বনী ইসরাঈলের اجعل لنا الها كما لهم الهة (হে মূসা! এদের উপাস্যের ন্যায় আমাদেরও উপাস্য নির্ধারণ করে দিন) আবেদনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তা হলে এতটুকু সাদৃশ্য যে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপছন্দ করে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন সেস্থলে মুশরিকদের পরিপূর্ণ অনুকরণ আরও তীব্রভাবে নাজায়েয ও অবৈধ সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য। এই হলো অত্র অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

যাই হোক, যুক্তি ও কুরআন-হাদীসের বর্ণনাসূত্র উভয় দিক থেকেই প্রমাণিত যে, আলোচ্য আনন্দোৎসব ভিত্তিহীন, নব আবিষ্কৃত, নাজায়েয, বিদ'আত এবং অবশ্যবর্জনীয়। সারকথা—অনির্দিষ্ট আকারে শরীয়তের পক্ষ থেকে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক আনন্দের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন বিশেষ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট না করে উপরোল্লিখিত আয়াতের ওপর আমল করতে আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করি।

—আস্‌সুরুর, পৃষ্ঠা ২৯

প্রশ্ন ঃ ২৩. কবর পাকা করা শরীয়তবিরোধী ও আল্লাহওয়ালাদের অভিরুচির পরিপন্থী।

ভক্তি ও সম্মানের আতিশয্যে আউলিয়াগণের মাযারে প্রকাণ্ড দালান নির্মাণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য যদিও তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে গর্হিত উপায়ে। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ। বস্তুত কবর পাকা করার মধ্যেই তাঁদের সম্মান সীমিত নয়; বরং কাঁচা কবরেও ওলী-আল্লাহ্গণ

একইরূপ মর্যাদায় ভূষিত। বরং সুন্নতের অনুসরণের দরুন কাঁচা কবরে নূরের জ্যোতি অধিক পরিমাণে বিকশিত। শায়খ বখতিয়ার কাকী (র)-এর কাঁচা কবরে এমন দীপ্তির প্রকাশ ঘটে যা রাজা-বাদশাদের মাযারে এর বিন্দু পরিমাণও লক্ষ করা যায় না, অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই তা অনুভব করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে জ্ঞানান্ধ ব্যক্তির কুরআন-হাদীসের দলীলের প্রতি চোখ বুলিয়ে নেয়া উচিত যে, খোদায়ী নূর সর্বতোভাবে সুন্নতের সাথে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত মাযার পাকা করাটা রাজ-রাজড়ার আয়েশী কল্পনার বিলাসী ফসল মাত্র যাতে নূরের ছোঁয়া আশা করা বৃথা। বলা বাহুল্য, মাযার পাকা করার মতো অবসরই তাদের কোথায় যাদের নিজ দেহের পর্যন্ত খবর থাকে না। এসব বিলাসিতা রাজ-রাজড়ার কল্পনা, দীনের সাথে সম্পর্ক যাদের শূন্যের কোঠায় এবং দিবা-নিশি যারা পাপাচারে বিভোর। আউলিয়াগণের অবস্থান এসব রঙিলা স্বপ্নের বহু উর্ধ্বে। জনৈক ধনী ব্যক্তি মূল্যবান একটি 'পুস্তীন' মাওলানা গাংগুহী (র)-এর খিদমতে হাযির করে বলল ঃ হুযূর! এটা ব্যবহার করুন! তিনি এক নবাবকে দান করে বললেন ঃ নবাব সাহেব! এটি আপনি ব্যবহার করুন। আপনার পোশাকের সাথে এটা সুন্দর মানাবে। এ মোটাসোটা পোশাক-আশাকে আমি আর কি সুন্দর দেখাব। পোকা-মাকড় থেকে এর হিফাযতের অবসরই বা আমার কোথায়। অযথা পড়ে পড়ে নষ্ট হবে আমার এখানে। এর চেয়ে ভাল আপনি কাজে লাগিয়ে ফেলুন।

মোটকথা—আউলিয়াগণ নিজ দেহের ব্যাপারে এসব ঝুট-ঝামেলায় থাকতে নারাজ, সে ক্ষেত্রে সমাধি-সৌধ রচনা করা তাঁদের মার্জিত রুচির বাইরের বিষয়। দ্বিতীয়ত, কবরের উদ্দেশ্য হলো—যিয়ারত দ্বারা মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। পার্থিব দুনিয়ার স্থিতিহীনতার রূপরেখা সামনে ভেসে ওঠলে কবর পাকা হোক কি কাঁচা তাতে কি যায় আসে। ভাঙা কবরেও মনে পরিবর্তন আসতে পারে। এতসব শাহী বালাখানায় মৃত্যু কিংবা আখেরাতের কথা চিন্তাই করা যায় না। যদি বলা হয়—এ ধরনের কবর দর্শন করাতে অন্তরে বুযুর্গদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানের সৃষ্টি হয়, তাহলে আমি বলব ঃ এ ভালবাসা তাযিয়ার ন্যায় যে, তাযিয়া নির্মাণ ও শহীদানের শোকগাঁথা ব্যতীত কান্নাই আসে না। খাঁটি প্রেমের জন্য অত শত আয়োজনের দরকার পড়ে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সাহাবীগণের মহব্বতের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল, এ কথা কি কেউ বলতে পারে? সাহাবীগণ তাঁর ওযূর পানিটুকু পর্যন্ত মাটিতে পড়তে দেননি। হাতে হাতে উঠিয়ে চোখে-মুখে মলার জন্য তাঁদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা লেগে যেত। তা সত্ত্বেও তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর পাকা না করে বরং কাঁচাই রেখেছিলেন। কারণ কবর পাকা করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করে

গেছেন। অথচ তাঁর কবর পাকা করাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সাহাবীগণের ভক্তি ও ভালবাসার নির্মল দাবি। কিন্তু তাঁরা এ জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে সর্বদা বিরত রয়েছেন। বলা বাহুল্য, আউলিয়াগণের নিজেদের জান ও মাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তুষ্টির অঙ্গনে ছিল নিবেদিত। তাঁর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের পরম পাওয়া। যদি বলা হয়—মাযার পাকা করাটা আউলিয়াগণের নিদর্শন অম্লান থাকার লক্ষণ। প্রথমত, এর জবাবে আমি বলব ঃ আল্লাহ্ তাঁদের স্থায়িত্বের যিম্মাদার। তাঁদের স্থিতি মানুষের আয়ত্তে নয়। লক্ষ করুন, পাকা কবরের বহু বাসিন্দা এমনও রয়েছে যাদের চিহ্ন পর্যন্ত কারো পরিচিত নয়। তবে কি কবর পাকা করাটাই স্থায়িত্বের উপায়? আদৌ না। জানা দরকার—আউলিয়াগণ আপনাদের স্থায়ী রাখার মুখাপেক্ষী নন। নিজেদের সাধনা-কৃতিত্ববলেই তাঁরা চির অম্লান, চির ভাস্বর। আপন জ্যোতিতে তাঁরা উজ্জ্বল—জ্যোতির্ময়। আরেফ (র) বলেন—

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

—অমর-অক্ষয় সে ব্যক্তিসত্তা, প্রেমরসে যার অন্তর সজীব-সতেজ, লয় নাই তার ক্ষয় নাই স্মৃতি তার স্থায়িত্বের অঙ্গনে।

মাওলানা নিয়াযের ভাষায়—

طمع فاتحه از خلق نداریم نیاز

عشق از پس من فاتحه خائم باقی ست

—মানুষের ফাতিহা পাঠের বাসনা আমার নাই হে নিয়ায! মৃত্যুর পর আপন প্রেমই পিছনে আমার ফাতিহা পাঠকারী বাকি রইল।

দ্বিতীয় জবাব এই যে, স্মৃতিচিহ্ন বাকি রাখার এটাও একটা উপায় যে, কবর কাঁচা রেখে প্রতি বছর মাটি ফেলে তাতে লেপপোচ দেয়া এবং আবর্জনামুক্ত রাখা। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কেবল সে সকল বুযুর্গের কবরই পাকা করা হয় তাদের নিজের বিশ্বাসমতে যারা সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাদের ধারণায় সুন্নতের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসারী বুযুর্গদের কবর সাধারণত কাঁচাই রাখা হয়। সুতরাং হযরত শায়খ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর মাযার কাঁচাই রাখা হয়েছে—সেখানে নারীদেরও সমাগম হয় না। তাঁর কবরের আশেপাশের লোকদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল ঃ হুযূর ছিলেন শরীয়তের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। তাই এসব তাঁর কবরের পাশে বৈধ রাখা হয়নি। তাহলে এর অর্থ

দাঁড়ায়—অন্য বুযুর্গরা যেন শরীয়তের অনুসারী ছিলেন না। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, এ কথার মর্ম ফলত আপন বুযুর্গদের ওপর শরীয়তের অনুসারী না হওয়ার অপবাদ আরোপের নামান্তর। সুতরাং এ কারণেও এহেন কাজ অবশ্য বর্জনীয়।

শরীয়তে কবর পাকা করা নিষিদ্ধ হওয়ার আরও একটি কল্যাণকর দিক লক্ষণীয় যে, বস্তুত এর দ্বারা শরীয়ত আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ দেখিয়েছে এভাবে যে, মানব বসতির সূচনা থেকেই পাকা কবরের রেওয়াজ চালু থাকলে বর্তমানে আমাদের পক্ষে ক্ষেত-খামারে ফসল করা তো দূরের কথা বাসের জন্য বাড়ি-ভিটা পাওয়াই কঠিন ছিল। কারণ এত অধিক পরিমাণে লোক কবরস্থ হয়েছে যে, বিশ্বের বা মাটির কোন অংশ মুর্দাশূন্য নয়। তাহলে বলুন, সবার জন্য কবর পাকা করা হলে আমাদের ঠিকানা হতো কোথায়? অগত্যা পাহাড়সম দোতলা, তিনতলা কিংবা ততোধিক সুউচ্চ কবর দেয়ার অনিবার্যতা দেখা দিত। অথচ কবর কাঁচা রাখার মধ্যে বিস্তর সুবিধা। পুরাতন কবরের চিহ্ন মুছে গেলে একই স্থানে পুনরায় কবর খোঁড়া যায়। তদুপরি জমি ওয়াকফকৃত না হলে দীর্ঘদিন পর তাতে ফসলও করা যায় যদি মৃতের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়া নিশ্চিত হয়। বর্তমানকালের জনসংখ্যার দৃষ্টিতে জরিপ করলেই এর প্রমাণ পাওয়া কষ্টকর নয় যে, সকল স্থানেই মুর্দা রয়েছে কেননা একই সময় এত পরিমাণ জীবিত লোকের বিশ্বে ছয়-সাত হাজার বছরের সুদীর্ঘ এ পরিমণ্ডলে কত অসংখ্য পরিমাণ লোক বাস করতে পারে? জনপ্রতি কবরের জন্য জমির পরিমাণ হিসেব করা হলে পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তনে কুলাবার কথা নয়। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের প্রতি লক্ষ্য করেই সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীদের মন্তব্য: "আজকে সকল মানুষ জীবিত থাকলে মাটিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলা ভার ছিল।" মোটকথা, কবর পাকা করা হলে এ সমস্যার সৃষ্টি হতো। অথচ কবরবাসীদের স্থানেই আজ আমরা বাস করছি, আমাদের দাফন চলছে। তাদের দেহ মিশ্রিত মাটি দ্বারাই আমরা বাড়ি তৈরি করছি। আমাদের ব্যবহারের থালা-বাসন, লোটা-ঘটি-বাটি সবই আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহ গলিত মাটির তৈরি। উপরন্তু অস্তিত্বহীন করার উদ্দেশ্যেই মৃত্যুর আগমন। সুতরাং স্থায়িত্বের এত সব আয়োজন অর্থহীন প্রচেষ্টা মাত্র। কেউ বলতে পারে—কবর থেকে ফয়েয লাভের কারণে একে বাকি রাখা জরুরী। হ্যাঁ, আমিও এটা স্বীকার করি, কিন্তু সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কেননা কবর থেকে প্রাপ্ত ফয়েয দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি কিংবা উন্নতি ঘটে না। তবে লাভ এতটুকু হয় যে, অধ্যাত্ম পথের পথিকের খানিকটা সহায়তা মিলে যার স্থায়িত্ব অতি অল্প সময়ব্যাপী। এর দৃষ্টান্ত যেমন চুলার ধারে বসা ব্যক্তি সামান্য উত্তপ্ত হয় বটে,

কিন্তু উঠে গেলেই পুনরায় ঠাণ্ডা বাতাসে তার শরীর শীতল হয়ে আসে। কিন্তু এ পথের পথিক যে নয় তার ভাগ্যে ফয়েযের ছোঁয়া বিন্দুমাত্র না লাগাই স্বাভাবিক। অবশ্য জীবন্ত বুযুর্গের ফয়েয এরূপ, যেন শক্তিশালী ঔষধ সেবনে সারা শরীরে শক্তি সঞ্চার হয় এবং শরীর সবল-সতেজ হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রথমত সে পথের পথিকের কবর থেকে ফয়েয অর্জনের প্রয়োজনই পড়ে না, জীবিত শায়খ তার পক্ষে কবর অপেক্ষা অধিক উপকারী। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন যদিওবা পড়ে কোন অধ্যাত্মবাদীর জন্য কবর পাকা হওয়া অথবা না হওয়াতে কিছুই যায় আসে না। তিনি তো নিদর্শন দ্বারাই বুঝে নেবেন এখানে কোন্ বুযুর্গ শায়িত। সুতরাং এ যুক্তিও কার্যকরী নয়। —আল ফাযুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৫৬

২৪. রবিউল আউয়ালের নির্দিষ্ট তারিখে মিলাদ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, শরীয়তসম্মত ব্যবস্থাপনা, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

মন চায় পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে কিছু বলি। কেননা এটা মহানবী (সা)-এর বিশ্ব জগতে আগমনের মাস। এ সময়ে তাঁর স্মরণেচ্ছা অন্তরে তীব্র হয়ে ওঠে এবং এর জন্য তাতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ মাসে মহানবী (সা)-এর জীবনী আলোচনা তাঁর সাথে ভালবাসারই নিদর্শন যদি তা ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথামুক্ত হয়। কিন্তু আজকের মিলাদ অনুষ্ঠান প্রচলিত রেওয়াজ আশ্রয়ী হওয়ার দরুন মুফতিগণকে দুঃখের সাথে এর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করতে হচ্ছে। নতুবা মূলত এটা কোন বিরোধীয় কিংবা বিতর্কের বিষয় ছিল না। কিন্তু "মুনাফা অপেক্ষা ক্ষতি নিবারণ আগে দরকার" এ নীতির আশ্রয়ে বাধ্য হয়ে মুফতিগণ এ পদক্ষেপ নিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, জন্মগতভাবেই মুসলিম জাতি রাসূলপ্রেমিক। যার জন্য এর তাবলীগ ও প্রচার ওয়াজিব নয়, মুসতাহাব। কিন্তু ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় মহানবী (সা)-এর জীবনী আলোচনা বৈধ ও মুসতাহাব হওয়ার শর্ত হলো শরীয়তবিরোধী আচার-অনুষ্ঠান থেকে তা মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। এখন মাসআলার হিসেবে সূফী এবং আলিমগণের মধ্যে মানগত বিরোধ রয়েছে। সূফী সম্প্রদায়ের মতে—মুস্তাহাব কাজ কোন অবস্থাতেই বর্জন করা চলবে না, অবশ্য ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের সংস্কার করতে হবে। পক্ষান্তরে আলিমগণের মতে সময় বিশেষে স্বয়ং মুস্তাহাব কাজটি বর্জন করা ব্যতীত তার সংশোধন সম্ভব নয়। কাজেই সে কাজটিকেই সাময়িকভাবে বর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে আলিমদের মতই গ্রহণীয়। কেননা সূফীগণ মূলত ভাবাবেগে পরিচালিত, পরের ও সমাজের

কল্যাণ চিন্তা এবং সে ব্যবস্থার গুরুত্ব তাঁদের নিকট গৌণ। এ কথা কেবল সেসব সূফীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নিরেট সাধক, হক্কানী আলিম নন। কিন্তু আলিমরা সমাজের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক যাদের রায় অব্যবস্থাপকদের মতের ওপর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আলিম ও সূফী এ-দুজনের ব্যবধান লক্ষ্য করুন। যেমন মহামারীর সময় সকল চিকিৎসক ঐক্যবদ্ধ রায় দিল—বর্তমান সময়ে আমরূদ খাওয়া ক্ষতিকর। এ সত্ত্বেও কোন চিকিৎসক আমরূদ খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ না করে পরিমিত পরিমাণে খেতে থাকে, কিন্তু অপরজন নিজে আমরূদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। তার ধারণা, আমি হয়তো পরিমাণ বজায় রেখে খেয়ে যাব কিন্তু আমার ন্যায় অন্যদের পক্ষে তো পরিমাণ বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই তারা অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদে পতিত হবে। তার চেয়ে ভাল, নিজেই বর্জন করে দেই। সুতরাং সে নিজেও খায় না অপরকেও ঢালাওভাবে নিষেধ করে। এমনকি ঝুড়িসহ গর্তে নিক্ষেপ করে দেয়। এমতাবস্থায় দর্শকরা মনে করে, আমরূদের প্রতি এই জনের আগ্রহ কম। আর খাচ্ছেন যিনি, তিনি বড় আমরূদপ্রিয় লোক। কিন্তু জ্ঞানী মাত্রই বুঝতে পারে দ্বিতীয়জনের আগ্রহ সবার তুলনায় বেশি কিন্তু জনগণের মঙ্গল চিন্তায় তার এহেন আচরণ। এখন বলুন, অনুসরণীয় কোন্ জন ? দ্বিতীয়জন অবশ্যই। কেননা তার ব্যবস্থাই কল্যাণধর্মী আর সবার নিকট প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং এমনি অবস্থা একজন সূফী ও একজন আলিমের মধ্যে। সূফী-সাধকরা মনের আগ্রহ দমন না করে মুস্তাহাবের ওপর আমল করেন, সাথে সাথে অবৈধ কার্যকলাপ সংশোধনেরও ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু আলিমগণ সমাজের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি দাবিয়ে রাখেন এবং দৃশ্যত মুস্তাহাব কাজও বর্জন করে বসেন। কারণ তিনি জানেন—এছাড়া অবৈধ কর্মকাণ্ড নির্মূল করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। বন্ধুগণ ! চারদিকে মিলাদের আয়োজন দেখে আমাদের কি মন চায় না এতে শরীক হই ? কিন্তু একমাত্র জনকল্যাণ কামনায় আমরা ইচ্ছা শক্তিকে দাবিয়ে রাখি।

—নুরুল আনোয়ার, পৃষ্ঠা ৫

এ পর্যায়ে "মহানবী (সা)-এর জীবনী আলোচনায় আমরা অন্তরায় সৃষ্টি করি" বলে মানুষ আমাদের দুর্ণাম রটায়। استغفر الله আল্লাহ মাফ করুন। রাসূল-(সা)-এর আলোচনা, তাঁর প্রেম-ভালবাসা তো আমাদের ঈমানের অঙ্গ। তাহলে ঈমান-বিষয় থেকে কোন মুসলমান কি নিষেধ দিতে পারে ? আসলে বরং রাসূলের আলোচনার সাথে জড়িত অসিদ্ধ-অনৈসলামী কর্মকাণ্ড সমাজ থেকে উৎখাত করাই আলিমদের মূল উদ্দেশ্য। আর উক্ত আলোচনার চল্তি ধারা অব্যাহত থাকা অবস্থায় এ কাজ সম্ভব

নয়। তদুপরি নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক অনুষ্ঠান ওয়াজিব নয় তাই তাঁরা মূল বিষয় তথা শর্তসাপেক্ষ মিলাদ মাহ্ফিলকেই নিষেধ করে দেন।

এসব অবৈধ কাজের মধ্যে কিয়াম করাও একটি। এ ব্যাপারে সর্বসাধারণের আকীদা-বিশ্বাস বর্তমানে শরীয়তের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কিয়ামের ব্যাপারেও মানুষ আলিমদের বদনাম রটায় যে, এটা তো রাসূল (সা)-এর যিক্র অথচ মাওলানারা এটাকেও বাধা দেয়। জনৈক আলিম এর সুন্দর জবাব দিয়েছেন যে, আসলে আমরা রাসূল (সা)-এর সম্মান করাকে নিষেধ করি না বরং সম্মানের নামে তাঁর অসম্মান থেকেই আমাদের নিষেধ। কেননা মিলাদ অনুষ্ঠানে আল্লাহ্র যিক্রের কালে তো তোমরা কিয়াম করা থেকে বিরত থাক। তাই মিলাদ মাহ্ফিলের বক্তা ও শ্রোতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই দাঁড়ানো অবস্থায় যদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তবে আমাদের কোন নিষেধ নেই। মজার ব্যাপার হলো, এ ধরনের আপত্তি কেবল আলিমদের বিরুদ্ধেই উত্থাপন করা হয়, সূফীদের বিরুদ্ধে নয়। অথচ কোন কোন সময় তাঁরা আলিম সমাজ অপেক্ষা কঠোর নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সুতরাং হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র দরবারে এক ব্যক্তি জোরে আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করে। তিনি বললেন ঃ বের করে দাও একে দরবার থেকে। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন নকশ্বন্দী তরীকার পীর। আর এ-তরীকায় মনের হাল দমন রাখার নিয়ম, এমন কি আল্লাহ্র যিক্র পর্যন্ত এ তরীকায় নীরবে করতে হয়। উচ্চকণ্ঠে যিক্র করা এ-তরীকার নীতির বাইরে। এরই প্রেক্ষিতে ছিল তাঁর এ কঠোর নির্দেশ। উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণের দায়ে দরবার থেকে বের করে দেয়ার হুকুম দৃশ্যত নির্দয়-নিষ্ঠুরই ছিল। কোন আলিম এ আচরণ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া পর্যন্ত জারি হওয়া বিচিত্র ছিল না যে, দেখ, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণে তিনি বারণ করেন। কিন্তু সূফীদের বেলায় এ জাতীয় কোন আপত্তি উঠতে দেখা যায় না। আসল মর্ম এ থেকেই শীঘ্র বুঝে আসে যে, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণের দায়ে নয় বরং তাকে বের করা হয়েছে মনের অবস্থা দমন করতে না পারার অপরাধে। আনুষঙ্গিক অবস্থাদৃষ্টে হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে ব্যক্তির দমন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে অবহেলা করেছে। এ বিশ্বাস না থাকলে তাঁর পক্ষে এধরনের হুকুম না দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এ মর্মে মনীষী শেখ সা'দী বলেছেন ঃ

دمادم شراب الم در کشند

وگر تلخ بینند دم در کشند

به تسلیم سر در گریبان برند
چوں طاقت نماند گریباں درند

—সদা-সর্বদা প্রেমের মদিরা তারা পান করে থাকে, আর যদি অতিশয় তিক্ততা অনুভব করে তখন বিরত থাকে। আনুগত্যের আকারে মস্তক আঁচলে আবৃত রাখে, অক্ষম ও অধৈর্য হয়ে পড়লে আঁচল ছিঁড়ে ফেলে।

আলিমদের অবস্থাও তদ্রূপ, তাযীমার্থে কিয়াম করাকে তারা নিষেধ করেন না, বরং সম্মানের নামে শরীয়তের সীমালংঘন করা থেকেই তাঁদের যত নিষেধ যা ইসলামের নামে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিন্তু সমাজে বেচারাদের দুর্নাম। তাঁদের উক্তির মর্ম অনুধাবনের কোনই চেষ্টা করা হয় না, অথচ ইসলামের হিফাযতের উদ্দেশ্যে নিজের নাম-বদনামের তাদের কোনই পরোয়া নেই। যার যা ইচ্ছা বলুক। 'আটাওয়া'তে জনৈক গাজীপুরী মৌলভী আমাকে বলল ঃ দেওবন্দী আলিমদের তাকওয়া-পরহেযগারীর বিশ্বজোড়া খ্যাতি, সবাই তাদের ভক্ত। কিন্তু একটি মাত্র বিষয়ে তাদের ওপর মানুষের আপত্তি যে, আপনারা কিয়ামের বিরোধী। একে সমর্থন করে নিলে সারা জাহান আপনাদের গোলামে পরিণত হয়ে যেত। আমি বললাম ঃ গোটা দুনিয়ার মানুষ আমাদের ভক্ত হোক কিংবা অভক্ত তাতে কিছুই আসে যায় না। সব আমাদের মনিব হয় হোক, তাই বলে ইচ্ছা করে আমরা অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে পারি না। —ঐ...পৃষ্ঠা-৫২

২৫. পাঞ্জেগানা নামায, ফজর কিংবা আসরের পর সমবেতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে যিক্‌র করা বিদআত।

আজকাল বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেক নামাযের পর অথবা ফজর কিংবা আসরের পর সকল মুসল্লি মিলিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে নিয়মিতভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু যিক্‌রে প্রবৃত্ত হয়। অথচ বুযুর্গরা সাধারণভাবে সবার জন্য নয়, বরং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে এ নিয়ম নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা এটাকে সবার জন্য নিয়মিত প্রথা বানিয়ে নিয়েছে। এ জন্যই আলিম সমাজ এটাকে বিদ'আতরূপে চিহ্নিত করেছেন। এখন তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়—শোন ভাই সকল! আলিমরা বলে ঃ আল্লাহর যিক্‌র করাও নাকি বিদ'আত। হায়রে আলিমদের বিপদ! কোন দলই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু সুবিজ্ঞ সূফীকুল সন্তুষ্ট এবং আলিমদের যথার্থ মর্যাদাও তাঁরা দিয়ে থাকেন। সুতরাং বিজ্ঞ সূফী আল্লামা শা'রানী বলেন ঃ সূফীদের পথ অতি সূক্ষ্ম, যা সাধারণ লোকের জ্ঞানের ঊর্ধ্বের বিষয়। তাই সাধারণ মানুষ সূফীদের অনুসরণ না

করে বরং আলিম সমাজের অনুসরণ করা উচিত। কেননা আলিমগণ সমাজ পরিচালক। শরীয়তের বিধি-বিধান এবং জাগতিক শান্তি-শৃংখলা একমাত্র আলিম সমাজের পদাংক অনুসরণেই বজায় থাকা সম্ভব। আমার শ্রদ্ধেয় মামা বলতেন—আলিম সমাজের অস্তিত্ব বর্তমান না থাকলে মানুষকে আমরা কাফির বানিয়ে ছাড়তাম। কেননা আমাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে, ভুল বোঝাবুঝির দ্বন্দ্বে পড়ে তারা ঈমানই হারিয়ে ফেলত। আলিমদের বিশেষ অনুগ্রহ যে, তাঁরা মানুষের ঈমান রক্ষার উপায় নির্দেশ করেছেন। কাজেই আলিমদের প্রতি অসন্তুষ্ট আর তাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী হে সূফীকুল! তাদের অনুগ্রহ স্বীকার কর, যেহেতু আলিম সমাজের কল্যাণেই নিরাপদ আশ্রয়ে এবং শান্তিতে বসে তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্‌র করা সম্ভব হচ্ছে। শান্তি রক্ষাকারী পুলিশের মূল্য বুঝে আসে গভীর রাতে যখন শান্তির বিছানায় গা এলানো হয়। সুতরাং আলিমরা পুলিশের ন্যায় পাহারার আড়ালে মানুষের ঈমান রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ দায়িত্ব তারা ত্যাগ করে বসে গেলে সূফী সাহেবকে খানকার বাইরে এসে এ কাজে অগ্রণী হতে হবে। নতুবা তার আত্মিক সাধনা আর আধ্যাত্মিক উন্নতি সবই উচ্ছন্নে যাওয়ার যোগাড় হবে। মানুষের চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব সম্পাদন করা "ফরযে কিফায়া", আলিমরা এ কাজ ত্যাগ করলে সূফীদের মোল্লা হওয়া ফরয হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এই শান্তিরক্ষা বাহিনী বর্তমান থাকা পর্যন্তই তোমার গাঠুরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত। রাতের বেলা তোমরা নিশ্চিন্তে বেঘোর নিদ্রায় অচেতন, চোখ খুলতেই নামায-যিক্‌রে বসে পড়। আর আলিমদের অবস্থা তো এই যে, ইসমাঈল শহীদ (র) রাতের আঁধারে সাইয়্যেদ সাহেবের মেহমানদের পা-টিপে দিতেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন—সাইয়্যেদ সাহেবের ভৃত্য আমি। জবাব শুনে তারা চুপ করে যেতেন। বহুদিন পর রহস্য জানা গেল যে, মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের কাজ এটা। এটা ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গদের বৈশিষ্ট্য। এর চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা শুনেছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান সম্পর্কে। শুনলে শরীর শিউরে ওঠে—কি প্রকারে যে নিজের অস্তিত্বকে তাঁরা বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটা হলো—একবার তাঁর বাড়িতে জনৈক মেহমান আসে, তার সাথে একজন কাফিরও ছিল। দুপুরের গরমে তারা শুয়ে পড়লে চুপে চুপে তিনি ঘরে ঢুকে সে হিন্দু অতিথির পা-টেপা শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ ঘটনাক্রমে আমি তখন জেগেছিলাম, অবস্থা দেখে আমি অবাক ও ভীত হয়ে আরয করলাম—হুযূর! একি করছেন ? বললেন ঃ বেচারা ক্লান্ত, ওর অবসাদ দূর করছি। আমি বললাম ঃ হুযূর! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মেহেরবানী করে

আপনি সরে যান। তিনি বললেন ঃ তুমি নিজেই তো ক্লান্ত, তদুপরি মেহমান, তাই আরাম কর। জানি না কতক্ষণ তিনি এ কাজে লিপ্ত ছিলেন, আর সে তো নিদ্রায় বিভোর। হবেই না বা কেন, কাফিরের চোখ তো খোলে মরার পর, আযাবের ফেরেশতা হাজির হলে। আসলে এরা জেগেই ঘুমায় কিনা। যাহোক মাওলানা বস্তুত খোদাই প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন বলেই এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। আজকালের কোন সূফী-সাধক এ ধরনের নযির স্থাপন করেছেন বলে তো শোনা যায় না। তাহলে আলিমদের বিরুদ্ধে জাবর কাটে তারা কোন্ মুখে ? —আর্ রাগবাতুল মারগূবাহ্, পৃষ্ঠা ৩০

২৬. গদীনশীনী মীরাসী সম্পত্তি নয়, নিছক প্রথা বিশেষ।

সাম্প্রতিককালের গদীনশীনী মীরাসী সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, গদীতে চাই গাধাই চড়ে বসুক। এক সময় তো পীর সাহেব মুরীদের মাথায় খিলাফতের পাগড়ি পরাতেন, আর পীরের ইনতিকালে বর্তমানে মুরীদরা পীরের মাথায় খিলাফতের পাগড়ি বেঁধে পীরযাদাকে গদীতে বসায়। আর কি এক মুহূর্তে সে সবার পীর হয়ে গেল। অবাক কাণ্ড, আজীব সব কারবার। আমাদের হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব স্থানকেন্দ্রিক এ গদীপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করে নিজের গদীকে তিনি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে গেছেন। তাই দেখা যায় এক গদী তাঁর গংগূহতে অপরটি দেওবন্দে [অর্থাৎ, মাওঃ কাসেম নানুতুবী (র)]। এমনিতর আরো বিভিন্ন স্থানে বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা কেন্দ্রীভূত গদীকে তিনি বিচ্ছিন্ন আকারে ছড়িয়ে দেন। আমি তো বলি—কেন্দ্রীভূত না হয়ে বরং গদী নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়াতেই অধিক মর্যাদা। পীরের গদী একই কেন্দ্রে অনড় থাকাতে তেমন বিশেষত্ব নেই। সুতরাং উত্তমরূপে বুঝে নিন—খিলাফত মীরাসী সম্পদ নয়। আমার নিজের ঘটনাই বলি ঃ জুমআর নামাযের স্থায়ী ইমামতির জন্য মহল্লাবাসীরা একবার আমাকে খুব করে ধরল। কয়েকটি শর্ত আরোপ করে আমি সম্মত হই। ১. ইমামতি আমার মীরাসী সম্পত্তি গণ্য হবে না। ২. আমার ওপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা চলবে না, যেকোন সময় দায়িত্ব ত্যাগ করার আমার অধিকার থাকবে। অতঃপর আমি ঘোষণা দিলাম—জনগণের প্রবল আগ্রহে আমাকে এ-দায়িত্ব নিতে হচ্ছে, স্পষ্ট ভাষায় বলছি, এতে আমার কোন অধিকার থাকবে না, অধিকন্তু আমার মীরাস এতে জারি হবে না। আমার ইমামতি কারো মনঃপূত না হলে চাই সে যে কেউ হোক—জোলা কিংবা কসাই হোক কাগজের টুকরায় "আপনার ইমামতি আমার পসন্দ নয়" মন্তব্য লিখে আমার নামে ডাক বাক্‌সে ফেলে দিলেই হলো। কসম খেয়ে বলছি, কোন জোলাও যদি না-পসন্দ করে সেদিন থেকেই আমি

ইমামতি ত্যাগ করব। এ ধরনের পাকাপাকি বন্দোবস্তের মাধ্যমে মীরাসের ছিদ্র বন্ধ করে তখন আমি ইমামতি করেছি। কিছুদিন পর নিজেই আমি ছেড়ে দিয়েছি। মোটকথা, ইমামতির ন্যায় গদীনশীনীও আজকাল মীরাসী সম্পত্তির রূপ ধরেছে আর মানুষও এটাকে তাযীম-তোয়ায দেখায়। তারা মনে করে এরই মধ্যে সবকিছু আয়-বরকত নিহিত। কিছুই না, সব প্রথার পূজা! বর্তমান পীর সাহেবদের মধ্যে আরো একটা রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায় যে, গদীতে বসার পর খানকার বাইরে আর তাদের দেখা যায় না। ভাগলপুর সফরে গিয়ে একবার শুনলাম সেখানকার জনৈক পীর সাহেব গদীতে আসীন হওয়ার পর আজ চল্লিশ বছর যাবৎ একনাগাড়ে খানকার বাইরে পা রাখেন না। তার মুরীদরা একথা গর্ব করে প্রচার করে বেড়ায়। আমি বললাম ঃ তিনি কি নারী না পর্দানশীন মহিলা ? পুরুষতো সে-ই, খোলা তরবারি হাতে যে ব্যক্তি ঘুরাফিরা করতে সাহসী। একই স্থানে অনড় থাকা পুরুষত্বের লক্ষণ নয়। অবশ্য অক্ষমতা কিংবা বিশেষ কোন অসুবিধা থাকে তো স্বতন্ত্র কথা। অত শত ব্যবস্থার পর বিশেষ কারণে কোন গদীনশীন পীরকে আদালতে তলব করা হলে তাকে হাজিরা থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। কেননা আজকালের পীরগণ আদালতে হাজির হওয়াকে আত্মমর্যাদাহানিকর মনে করে। কিন্তু আমার এটা বোধগম্য নয় এতে অপমানের কি আছে। কানপুরের এক মোকদ্দমা, কোন অবস্থাতেই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছিল না। অবশেষে হাকিম বললেন, আপনাদের কাউকে সালিস নিযুক্ত করে ফয়সালা করুন, অতঃপর আদালতের পক্ষ থেকে এটাকেই জারি করে দেয়া হবে কোর্টের রায় হিসেবে। উভয়পক্ষ এতে সম্মত হয়। পরে আদালতের পক্ষ থেকে কয়েকজন আলিমের নাম প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু দুইপক্ষ একমত হতে পারেনি। অবশেষে আমার নাম প্রস্তাব করা হলে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। যাহোক, সাক্ষী হিসেবে আমার নামে সমন আসে। এতে আমার কোন কোন বন্ধু আমার আদালতের হাজিরা অপমানকর মনে করে। আমি বললাম ঃ এতে অপমানের কি আছে, এটা তো বরং সম্মানের বিষয় যে, আমার কথায় মামলার ফয়সালা চূড়ান্ত হবে। যাহোক, আদালতে উপস্থিত হয়ে আমি বক্তব্য রাখি, যাতে আঠারো বছরের পুরানো মোকদ্দমা ফয়সালা হয়ে যায়। একবার বেরেলী গেলাম। সেখানকার সরকারী প্রধান কর্মকর্তা জ্ঞানী-গুণীজনদের সাক্ষাতপ্রয়াসী ছিলেন। আমার সাথেও সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখনো আমার কোন কোন সুহৃদের মত ছিল জেন্ট সাহেব স্বয়ং এখানে আসুন, এতেই সম্মান। আর হুযূর যাওয়াতে আমাদের অপমান। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম—তিনি এখানে আগমন করলে আমাকেই তাঁর সাদর-সম্ভাষণ জানাতে হবে।

আর আমি গেলে আমার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা, সাদর-সম্ভাষণের বন্দোবস্ত করতে হবে তাকে। যাহোক, আমি নিজেই গেলাম। তিনি আমার যথেষ্ট আদর-সমাদর করলেন। এটা তো ছিল আমার বন্ধু-বান্ধবের রুচিভিত্তিক জবাব। নতুবা আসল কথা হলো আল্লাহ্ তাদেরকে রাজত্বের অধিকারী বানিয়েছেন, শাসককে শাসিতের স্তরে নামিয়ে আনতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আল্লাহ্ সে জাতিকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছেন। কাজেই শিষ্টাচারের দাবি অনুসারে সে ধরনের আচরণই তার প্রাপ্য। এর জন্য কোন সরকারী কর্মকর্তা আমার সাক্ষাত চাইলে আমি নিজে তার কাছে যাওয়াটা পসন্দ করি। কিন্তু লোকাচার ও প্রথাকেন্দ্রিক সমাজে আজকাল এটাকে আত্মমর্যাদাহানিকর এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী মনে করা হয়।

যাহোক, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—"গদীনশীনীকে মীরাসী সম্পত্তিভুক্তকরণ" সংক্রান্ত দুষ্টপ্রথা। এর কুফল আরো লক্ষণীয়। কোন এক হিন্দু জমিদারীতে জনৈক কাজী সাহেব একজন বেনিয়ার নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সে কোর্টে নালিশ করাতে কাজী সাহেবের বিষয়-আশয় মায় ইমামতির আমদানি পর্যন্ত নিলামে ক্রোক হয়ে যায়। উল্লেখ্য, কাজী সাহেব এক ঈদগার ইমামও ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রণিধানযোগ্য। তার উপস্থিতিতে একবারের ঈদের ঘটনা ছিল এরূপ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ ঈদের জামাত পড়ার উদ্দেশ্যে ঘটনাক্রমে আমিও সে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। লক্ষ্য করি, জামা-কাপড় পাল্টে স্থানীয় লোকজন ঈদগাহে পৌঁছে ইমাম সাহেবের অপেক্ষায় বসে আছে। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল ধুতি-পরা লালাজী এগিয়ে আসছে। লালা সাহেব পৌঁছতেই লোকদের মধ্যে শোর পড়ে গেল—ইমাম সাহেব এসে গেছেন। আমি তো একেবারে থ, ইয়া আল্লাহ্! এ-আবার কেমন ইমাম। হিন্দু বেনিয়া কি পড়াবে তাহলে ঈদের নামায ? অতঃপর প্রথমত সালাম দিয়ে সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলল, ভাইগণ, ঠিক আছে ? সবাই বলল, জী হ্যাঁ, সব ঠিক। এরপর সে কাপড় বিছিয়ে দেয়, আর সবাই এতে টাকা-পয়সা ফেলতে থাকে। সবার দেয়া সারা হলে সব টাকা হিসেব করে খাতায় জমা দিল যে, এ বছর ঈদের আমদানি এত টাকা! পোট্‌লা বেঁধে কাঁধে ফেলে ফের বলল, ভাইসব! এবার আসতে পারি ? সবাই বলল, জী-আসতে পারেন। এরপর সালাম করে সে বাড়ির পথে রওয়ানা দিল। আর লোকজনও নামায, খোত্‌বা ছাড়াই বাড়ির পথে পা বাড়াল। বর্ণনাকারী অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, ভাই সাহেব! ঈদের নামায কি হবে না ? এতক্ষণে লোকেরা আসল ঘটনা রহস্যমুক্ত করল। যার সারমর্ম এই ঃ ইমাম সাহেব উক্ত বেনিয়ার নিকট ঋণগ্রস্ত, তাই কোর্টে নালিশ করে আদালতের ডিক্রিবলে সে কাজী সাহেবের ঈদগার আমদানি পর্যন্ত

ক্রোক করিয়ে নেয়। কাজেই কয়েক বছর যাবত তার ঈদগায় আগমন ও ইমামতি বন্ধ। কিন্তু আমাদের আসা-যাওয়া ঠিকই আছে। আমরা যথারীতি আসি, টাকা দেই আর বেনিয়া সেগুলো পোটলা বাঁধে। বিগত কয়েক বছর যাবত অবস্থা এই চলছে যে, নামায-কালাম তো বন্ধ, আমরা কেবল চাঁদা গণি। এই হলো—ইমামতি আর কাজীগিরি মীরাসী সম্পত্তি হওয়ার কুফল যে, হিন্দু বেনিয়া পর্যন্ত যার আয়-আমদানি নিলাম ডেকে ক্রোক করিয়ে নিতে পারে। গদীনশীনী মীরাস হওয়ার অপর কুফল হলো এই—বুযুর্গদের নামে প্রদত্ত টাকা-পয়সা, আয়-আমদানি অসৎ পথে এমনকি পতিতালয়ে পর্যন্ত উড়ানো হচ্ছে। যার ফলে হাজার হাজার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিনাশ হয়ে গেছে। বুযুর্গদের খানকার নামে ওয়াকফ করা সম্পত্তি মীরাসী স্বত্বের কারণে তাদের উত্তরাধিকারগণই এর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে যোগ্যতার কোন বাছবিচার নেই। বর্তমানে এতে মালিকানাস্বত্ব দাবির কারণে বহু ওয়াকফ সম্পত্তি বিলীন হয়ে গেছে। —ইসলাহু-যাতিল বাইন, পৃষ্ঠা ৪২

২৭. শিশুদের ঈদগাহে আনা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি সন্দেহের জবাব ঃ

ঈদগাতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এতে জমায়েত হওয়া বর্জন করা সমর্থনযোগ্য নয়। আর ছোট শিশুদের সাথে আনার প্রবণতা আমাদের দূর করা উচিত। এ ব্যাপারে নতুন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

جنبوا مساجدكم صبيانكم

—"শিশু-বাচ্চাদেরকে তোমরা মসজিদ থেকে দূরে রাখ।" ঈদগাহ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয় মনে করে সম্ভবত কেউ দলীল হিসেবে উক্ত হাদীস যথেষ্ট মনে না-ও করতে পারে। তাই এর জবাবে আমরা বলব مساجدكم শব্দের অন্তরালে দু'টি অর্থের অবকাশ রয়েছে ১. হয়তো এর ব্যাপকার্থটি মেনে নিতে হবে, যার অর্থ অনির্দিষ্ট নামাযের স্থান। এমতাবস্থায় উক্ত হুকুমে ঈদগাহের অন্তর্ভুক্তি সুস্পষ্ট, ২. নতুবা সে অর্থে স্বীকার না করা। এমতাবস্থায় দৃশ্যত যদিও ঈদগাহ মসজিদের শামিল নয় কিন্তু উক্ত হুকুমের কারণ আমাদের খুঁজতে হবে। সুতরাং পবিত্রতা রক্ষা করাই এর মূলীভূত কারণ। শিশুরা মূলত পাক-পবিত্রতা রক্ষা করতে অক্ষম। এদের যাতায়াতে নামাযের স্থান অপবিত্র এবং নামাযীদের মনের একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা প্রবল। আর উক্ত কারণ মসজিদের ন্যায় ঈদগাহেও সমভাবে বিদ্যমান। তাই সে হুকুম ঈদগার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ঈদগাহ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন

ঃ وليعتزلن الحيض المصلى (অর্থাৎ ঋতুমতী মহিলারা নামাযের স্থান তথা ঈদগাহ থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়)। উক্ত উপমা থেকে স্পষ্ট হয় যে, কোন বিষয়ের বাস্তবায়ন কাম্য না হওয়ার বেলায়ই কেবল এ বিধি প্রযোজ্য হবে। নতুবা বিষয়টির ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরসন করে আমরা সে হুকুম বর্জন না করে পালন করাই উচিত।

—ইকমালুস-সাওম ওয়াল ঈদ, পৃষ্ঠা ৬

২৮. মহানবী (সা)-এর এমন প্রশংসা করা জায়েয নহে যদ্দ্বারা পূর্ববর্তী নবীগণের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, কোন কোন নির্ভরহীন পুস্তিকার অসারতা প্রমাণ ঃ

একবার মহানবী (সা) জনৈক সাহাবীর উদরে অঙ্গুলি চেপে ধরলে সাহাবী বললেন ঃ আমি এর শোধ নেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) "ঠিক আছে নিয়ে নাও" বলে সাথে সাথে তার সামনে নিজের উদর বাড়িয়ে দিলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পেট ছিল উন্মুক্ত, আর আপনার তো কাপড়ে ঢাকা। শোনা মাত্র তিনি জামা উঠিয়ে দিলেন। উক্ত সাহাবী তাঁর উদর মুবারক জড়িয়ে ধরে ভক্তির চুমায় চুমায় সিক্ত করে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। 'ওফাতনামা' পুস্তিকায় লোকেরা হযরত উক্কাসের মনগড়া অলীক কাহিনী রটিয়েছে যা বাস্তবতা বিবর্জিত। বাস্তব ও সত্য ঘটনা তা-ই যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি। আমাদের এতদঞ্চলে মেয়ে মহলে প্রচলিত ও বহুল পঠিত পুস্তিকাদি সবই মনগড়া অবাস্তব কাহিনীর অবাঞ্ছিত সমাহার। এগুলো বর্জন করা উচিত। যেমন—স্বপননামা, মু'জিযা আলেনবী, ওফাতনামা, নূরনামা, মি'রাজনামা, আলী মুহাম্মদ ইত্যাদি। অবশ্য 'মু'জিযা হরিণী' সত্য ও নির্ভরযোগ্য পুস্তিকা। অপর একটি ষষ্ঠপদী কাব্যের চমকপ্রদ ও রঙ্গীলা ছন্দ নিম্নরূপ ঃ

مری بار کیوں دیر اتنی کری

—আমার বেলায় তোমার এত বিলম্ব কেন ?

আলোচ্য কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ, কোনখানে নবীগণের নবুয়তপ্রাপ্তির প্রতি হিংসা প্রকাশ আর কোথাও রাজা-বাদশাহের রাজত্ব লাভের প্রতি লোভ আর না পাওয়ার ক্ষোভ প্রকাশের পর লেখক ক্ষোভানলে দগ্ধ পরাণে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে কাব্য গড়ায় যে, এসব দয়া-অনুগ্রহ, দান-খয়রাত থেকে আমায় কেন বঞ্চিত রাখা হলো ? এ জাতীয় বই-পুস্তক নিজের কাছে রাখা এবং পাঠ করা তো দূরের কথা বিনা দ্বিধায় এগুলো অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ

করার যোগ্য। 'মু'জিযা আলেনবী' পুস্তকে বর্ণিত হযরত আলী (রা)-এর ঘটনা যে, "আপন পুত্রকে তিনি ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং ভিক্ষুক পরে তাকে বিক্রি করে দেয়" সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মনগড়া অলীক কাহিনী। তেমনি হযরত উক্কাসের নামে রটানো রসালো বিবরণও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। —মুযাররুল-মাসিয়ত, পৃষ্ঠা ৬

কোন কোন লেখক ও ওয়ায়েয কর্তৃক মহানবী (সা)-এর আংশিক ফযীলত এমন ঢংয়ে এবং বিচিত্র রংয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, যদ্দ্বারা অন্যান্য নবীর মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, যা তাঁদের সাথে বে-আদবীপূর্ণ আচরণের শামিল।

মাওলানা থানভী (র) বিষয়টিকে পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

ক. কোন কোন গ্রন্থকার অন্যান্য নবী (আ)-এর ওপর মহানবী (সা)-এর সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সযত্ন প্রয়াস চালায়। তাদের চেষ্টা-গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি অঙ্গনে সকল অংশে সমভাবে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত প্রমাণ করা। এর অনুকূলে কুরআন-হাদীসের কোন সূত্র থাকুক বা না-ই থাকুক। অথবা 'নস্' তথা কুরআন ও হাদীসের দলীল তাদের দাবির বিরোধী হোক কিংবা এর ফলে অন্যান্য নবী (আ)-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যাক, তাতে তাদের কোন পরোয়া নেই। নিজের দাবি তো প্রতিষ্ঠিত হলো! এ জাতীয় প্রয়াস অবাঞ্ছিত—অনভিপ্রেত। কেননা মহানবী (সা)-এর সার্বিক ও সামগ্রিক ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত, কিন্তু আংশিক বা আনুষঙ্গিক কিংবা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য অপর কারো পক্ষে প্রমাণিত হওয়াটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থী নয়, অথবা তাঁর মর্যাদায় কোন ত্রুটি আসারও কথা নয়। যেমন কারো দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া হযরত ইয়াকুব (আ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ নয়। সুতরাং হযরত ইউসুফ (আ)-এর রূপ-লাবণ্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস وهو قد اعطى شطر الحسن (অর্থাৎ রূপের অর্ধেক তাঁকে দান করা হয়েছে) দ্বারা প্রমাণিত। এখন এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌন্দর্য হযরত ইউসুফ (আ) অপেক্ষা অধিক প্রমাণের চেষ্টা করা স্বয়ং তাঁর হাদীসের বিরোধিতা এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর অনিন্দ্য রূপে খুঁত বের করার নামান্তর। যা একজন মহামান্য নবীর শানে চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। অবশ্য কথাটা এভাবে গুছিয়ে বললে উভয়কূল রক্ষা পায় যে, সৌন্দর্য দুই প্রকার ১. যা দেখামাত্রই দর্শককে বিস্মিত করে দেয়, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে তা সীমিত আকার বিশিষ্ট। ২. যা প্রথম দৃষ্টিতে দর্শকের চোখে তাক লাগায় না বটে, কিন্তু তা নিম্নোক্ত ছন্দের প্রয়োগক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হতে পারে। যেমন—

يزيدك وجهه حسنا – اذا ما زدته نظرا

—"তাঁর প্রতি যতই তুমি দৃষ্টিপাত করবে তার চেহারার রূপের ছটা তত বেশি তোমাকে মুগ্ধ-বিমোহিত করে তুলবে।" প্রথমটিকে 'ঊষার কিরণ' আর দ্বিতীয়টিকে 'পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো' আখ্যায়িত করা যায়। সুতরাং প্রথমটির হিসেবে হযরত ইউসুফ (আ) সৃষ্টিকুলের সেরা সুন্দর আর দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টিতে আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা)।

—মাকালাতে হিকমত, পৃষ্ঠা ১১, দাওয়াতে আবদিয়ত, ১ম খণ্ড

খ. সম্প্রতি কেউ কেউ মহানবী (সা)-এর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। (যেমন মাওলানা শিবলী রচিত 'সীরাতুন্নবী') তাতে মহানবী (সা)-কে সকল বৈশিষ্ট্যের আধার এবং পূর্ণাঙ্গ মানব প্রমাণের অন্তরালে বিগত নবীগণের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে অন্যান্য নবী (আ)-এর মর্যাদায় আঘাত হেনে এবং সমালোচনার ভঙ্গিতে 'সীরাতুন্নবীর' গ্রন্থকার লিখেন ঃ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, রাজ্যশাসনের অপরিসীম যোগ্যতা, সীমাহীন দয়া ইত্যাদি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিত্বের সহজাত বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে অন্যান্য নবী (আ)-এর কারো মধ্যে ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব, কারো মধ্যে দয়ার দীনতা, কারও চরিত্রে এ-গুণ ছিল না, কারও চরিত্রে অমুক বৈশিষ্ট্যের স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এর দ্বারা একদিকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসাই করেছেন কিন্তু প্রকারান্তরে এতে অন্যান্য নবীর সমালোচনাও করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে এই হলো তার আচরণ। এর একটি দৃষ্টান্ত এভাবে চিত্রিত করা যায়, যেমন আপন পিতার প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করলাম, তাকে সন্তুষ্ট করলাম কিন্তু তার ভাইকে করলাম অপমান। এ ধরনের প্রশংসা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুশি হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? অতঃপর গ্রন্থকার তার দাবির সমর্থনে প্রমাণ পেশ করে বলেছেন ঃ দেখুন নূহ (আ)-এর মধ্যে দয়ার মাত্রা অল্প ছিল, মায়ার উপাদান ছিল না। ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্বে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার উপাদান স্বল্প মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়, তিনি ছিলেন দরবেশী জীবন যাপনে অভ্যস্ত। মূল্যবান কাগজ ও সুশ্রী টাইপে মুদ্রিত আলোচ্য গ্রন্থ আমার সামনে পেশ করা হয়। গ্রন্থখানার বাহ্যিক অবয়ব অতি চমৎকার, কিন্তু এর অন্তর্ভাগ—"নূহ (আ) ছিলেন দয়াশূন্য, ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্বে রাজনৈতিক চিন্তাধারা অবর্তমান" ইত্যাদি কুৎসিত ও কদাকার বক্তব্যে ভরপুর। এ-যে হযরত আম্বিয়াগণের শানে কত বড় ধৃষ্টতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বন্ধুগণ! এটা কি করে জানা গেল যে, নবীগণের ব্যক্তি সত্তায় এসব উপাদান ছিল না। উপাদানের অস্তিত্বের জন্য তা প্রকাশ পাওয়াও কি অনিবার্য ? এক ব্যক্তি সম্পর্কে

শ্রুতি রয়েছে—লোকটি বড় দাতা, আপনি তার কাছে গেলেন এমন এক সময় যখন সে কাউকে কিছুই দান করছে না। তাই আপনি মন্তব্য করলেন—লোকটির দানশীলতার শ্রুতি ও খ্যাতি মিথ্যা—বানোয়াট। এমতাবস্থায় আপনার সম্পর্কে মন্তব্য হবে—ভাই সাহেব! আপনার গমন অসময়ে, দানের সময় গিয়ে দেখুন বুঝতে পারবেন তিনি কত বড় দানবীর। অনুরূপ আম্বিয়াগণের ব্যক্তিসত্তায় সকল বৈশিষ্ট্যের যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ হতে পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যখন যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয় তখন তা প্রকাশ পাবে। বস্তুত হযরত নূহ (আ)-এর দয়ার আন্দাজ করা যায় যদি তাঁর সাড়ে নয় শ বছর ব্যাপী আপন কওমের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করার প্রতি তাকানো হয়। কেননা এতসব সত্ত্বেও জাতির বিরুদ্ধে তাঁর মুখ থেকে অভিসম্পাত বাক্য উচ্চারিত হয়নি। এর চাইতে মহানুভবতা আর কি কল্পনা করা যেতে পারে ? পারবে কি ইতিহাস এর কোন নজীর উপস্থিত করতে ? অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যখন নির্দেশ এল انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن অর্থাৎ "ইতিমধ্যেই যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া এখন নতুন করে তোমার কওমের আর কেউ ঈমান গ্রহণ করবে না।" এরপরই কেবল তাঁর মুখে বদ্দোয়া উচ্চারিত হয়েছিল। বোঝা গেল তাঁর দু-ধরনের অস্ত্র ছিল। একটি দোয়া, অপরটি বদ্ দোয়া। সাড়ে নয় শ বছর ব্যাপী তিনি দোয়ার হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ হলো—দ্বিতীয় অস্ত্রটি নিক্ষেপ কর। এখন যেদিকে আল্লাহ্ সেদিকে তিনি। সুতরাং লক্ষ্য করুন—দয়া ও ধৈর্যের কি চরম পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন যে, সাড়ে নয় শ বছর অবধি কওমের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করেছেন অথচ তাঁর মুখ থেকে বদ্দোয়ার বাণ নিক্ষিপ্ত হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থকারের সমালোচনার অপর পাত্র হলেন হযরত ঈসা (আ)। তার মতে "তিনি ছিলেন ফকীর-দরবেশ। সভ্যতা ও রাষ্ট্র পরিচালন-নীতি তাঁর শিক্ষায় ছিলই বা কবে? তাঁর শিক্ষা তো ছিল এই যে, "কেউ তোমার একগালে চড় দিল তো অপরটা তুমি এগিয়ে দাও।" গ্রন্থকার কর্তৃক ঈসা (আ)-এর হক আদায় করার এই হলো নমুনা। আমার কথা হলো—"হযরত ঈসা (আ) রাজনৈতিক চেতনাহীন ছিলেন", গ্রন্থকারের এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব তারই ওপর। কেননা কোন কিছু অদৃশ্য বা লুপ্ত থাকাটা সেটির অস্তিত্বহীনতার পরিচায়ক নয়। দ্বিতীয়ত, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ) রাজত্ব করবেন, তাঁর শাসনামলে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রশক্তি বিলীন হয়ে যাবে এবং সারা জাহানের শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতের মুঠোয় ঠাঁই নেবে। সুতরাং তাঁর সত্তায় রাজনৈতিক চেতনা যদি বিদ্যমান

না-ই থাকল তাহলে তাঁর দ্বারা এত বড় প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করা কি করে সম্ভব ? এটা এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। গ্রন্থকারের ভাষায় কি তাহলে মেনে নিতে হবে যে, হযরত ঈসা (আ) ছিলেন রাজনৈতিক চেতনাহীন অসার ব্যক্তিত্ব ? এই হলো অবস্থা। যার কল্পনায় যা আসে তাই সে লিখে দেয়। খুব ভাল করে শুনে রাখুন আম্বিয়া (আ)-গণের ব্যক্তি-সত্তায় সৃষ্টিগতভাবেই যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের উপাদান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় আল্লাহর তরফ থেকে যখন যেটা ব্যবহারের হুকুম আসে। —আল-হায়াত, পৃষ্ঠা ২১

গ. পরিতাপের বিষয়, দর্শনবাদী কোন কোন লেখকও এ রোগে আক্রান্ত। আমার তো প্রাণ কেঁপে ওঠে এ ধরনের কল্পনায়। সুতরাং জনৈক লেখক হযরত মূসা (আ)-এর ওপর মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় বলেছে ঃ "হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) সাওর গুহায় কাফেরদের আগমন আশংকায় ভীত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বললেন ঃ لا تحزن ان الله معنا (চিন্তিত হয়ো না আমাদের সাথে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্)। প্রথমত لا تحزن (চিন্তা করো না) বাক্য দ্বারা আবূ বকর (রা)-এর চিন্তা লাঘব করেছেন। অতঃপর ان الله প্রথমে বলে "তাঁর সাথে আল্লাহ রয়েছেন" একথা বলার সময় معنا বহুবচন দ্বারা আবূ বকর (রা)-কেও নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ)-এর সাথীরা সৈন্যসহ ফেরাউনের আগমনাশংকায় ভীত হয়ে পড়লে তিনি বললেন ঃ كلا ان معى ربى سيهدين (কখনো নয়, আমার রব নিশ্চয়ই আমার সাথে রয়েছেন, যিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন)। এতে প্রথমে كلا সতর্কমূলক শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। আরবী বাকধারায় كلا শব্দটি সতর্ক ও হুঁশিয়ারমূলক অর্থে প্রয়োগের রীতি প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে كلا দ্বারা গালে চড় লাগিয়ে তাদেরকে যেন সাবধান করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর ربى (আমার রব) এর পূর্বে معى (আমার সাথে) কথাটি উল্লেখ করেছেন। লক্ষ করুন—ভাষার কি চমৎকার ভঙ্গিমা! গ্রন্থকার হযরত মূসা (আ)-কে যেন বাকরীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, হুযূর! নিজের আগে আল্লাহ্‌কে উল্লেখ করা আপনার উচিত ছিল। তিনি যেন কথা বলার ধরন সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। অধিকন্তু গ্রন্থকার মহানবীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ মূসা (আ) معى শব্দটি একবচনে প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র সাহচর্যকে আপন সত্তায় খাস করেছেন, নিজের কওমকে এতে শরীক করেন নি। উক্ত গ্রন্থকারের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে আমার অবাক লাগে—তার কলমে এ ধরনের লেখা আসল কিভাবে! আমি তো বলব ঃ سخن شناس نئى دلبر اخطا اينجاست (অর্থাৎ বন্ধু তুমি মর্ম বোঝ নাই, ভুলটি তোমার এইখানে)।

প্রথমত, আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি বিষয়ে তার আলোচনার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মহানবীর সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতই যথেষ্ট। এর জন্য সূত্রবিহীন খণ্ডিত ফযীলত প্রমাণের প্রয়াস অর্থহীন এবং পণ্ডশ্রম মাত্র। তা সত্ত্বেও কথা বলার এতই যার শখ—বলার আগে তার ভাবা উচিত যে, হযরত মূসা (আ)-এর শ্রোতা কারা আর মহানবীর সম্বোধন কার প্রতি। কেননা ভাষালংকার শাস্ত্রের নীতি হলো—স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বাক্য প্রয়োগ করা। সকল ক্ষেত্রে কথার ধরন অভিন্ন নয়। কবির ভাষায় ঃ هر سخن نكته و هر نكته مقامے دارد (অর্থাৎ স্থান ভেদে প্রত্যেক বাক্যের মর্ম ও রূপান্তর ভিন্ন জাতের হয়ে থাকে)।

প্রমাণকারীর যুক্তির বিপক্ষে সম্ভাবনার অস্তিত্ব তার দলীল বাতিলের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং সে সম্ভাবনার দৃষ্টিতে আমি বলব হযরত মূসা (আ)-এর সামনে হযরত সিদ্দিক (রা)-এর ন্যায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তিনিও সে একই ধরনের বাক্য প্রয়োগ করতেন যা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)। তদ্রূপ হযরত মূসার কওম মহানবীর শ্রোতা হলে তিনিও তাঁর ন্যায় একই বাক্যে সম্বোধন করতেন। ঘটনা হলো—আবূ বকর (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা হিজরতের উদ্দেশ্যে সাওর গুহায় আত্মগোপন করেন। আবূ বকর (রা)-এর আশংকা হয় গুহার গর্ত থেকে সাপ-বিচ্ছু বের হয়ে হয় তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দিতে পারে। তাই তিনি লুঙ্গি কিংবা চাদর টুকরা করে গর্তের সকল ছিদ্র বন্ধ করে দেন। কিন্তু টুকরা শেষ হয়ে যাওয়ায় একটি মাত্র ছিদ্র বাকি থেকে যায়। সেটি বন্ধ করার কিছু না পেয়ে নিরুপায় আবূ বকর (রা) নিজের পা চেপে ছিদ্রের মুখ আলগে রাখেন। যেন মহানবীকে বিষাক্ত কোন প্রাণী দংশন করতে না পারে। ছোবল যদি মেরেই বসে তা যেন তাঁর নিজের পায়েই লাগে। অবশেষে এক পর্যায়ে সাপ তাঁর পায়ে দংশন করেই বসল। নীরবে তিনি সাপের কামড় সহ্য করেন। এই ছিল তাঁর আত্মনিবেদনের অবস্থা। এমতাবস্থায় তাঁদের খোঁজে অনুসন্ধানকারী কাফেরদের আগমনে নিজের জীবনের নয়, বরং মহানবীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর এ আশংকার মূলে ছিল—কবির ভাষায় ঃ عشق است و هزار بد گمانى (অর্থাৎ কুৎসিত শত ধারণার বিপরীতে চির অম্লান সে নির্মল প্রেম)।

বস্তুত হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি অটল ভরসায় সমৃদ্ধ ছিল। এহেন ভক্তের দুর্ভাবনা লাঘবের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা হিসেবে মহানবীর উক্তি প্রথমত لا تحزن অতপর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে তাকেও শামিল করে নেয়াটাই ছিল যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়ত এক্ষেত্রে সীমিতকরণ উদ্দেশ্য ছিল না, তাই বাক্যগঠন প্রণালীর

আওতায় আল্লাহর যিক্‌রকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিয়ে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ ان الله معنا (আল্লাহ স্বয়ং আমাদের সাথে রয়েছেন।) পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ)-এর সাথীরা হযরত সিদ্দীকের ন্যায় আল্লাহ্ নির্ভরশীল কিংবা এমন নিবেদিতপ্রাণ ছিল না যে, নিজেদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থেকে তারা বেপরোয়া হয়ে কেবল মূসা (আ)-এর জীবন নিয়েই শংকিত থাকবে। বরং আপন প্রাণের মায়ায়ই তারা বিভোর ছিল এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তা প্রকাশও করেছে। কুরআনের বাণীই তার প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ قال اصحاب موسى انا لمدركون (অর্থাৎ মূসার সাথীরা বলল—আমরা তো পাকড়াও হয়ে যাচ্ছি)। আয়াতে, 'ইন্না', 'জুমলা ইসমিয়া' এবং 'লাম তাকীদ' এ তিনটি তাকীদ বর্ণিত হয়েছে যার অর্থ দাঁড়ায়—অবশ্যই আমরা ধৃত হবই। অথচ ফেরাউনের মুকাবিলায় মূসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র দেয়া সাহায্য একাধিকবার তারা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ্‌রই হুকুমে এবং মূসা (আ)-এর প্রতি সাহায্যের আশ্বাসবাণী শুনেই তারা প্রথমে মিসর থেকে রওয়ানা হয়েছিল। এতসব সত্ত্বেও তারা ছিল ধরা পড়ার দৃঢ় বিশ্বাসে কম্পিতপ্রাণ। এটা তাদের অপক্ক ঈমান এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরহীনতারই প্রমাণবাহী। কাজেই মূসা (আ) ধমকের সুরে তাদের গালে كلا (হতেই পারে না) শব্দের চড় বসিয়ে দিলেন যে, খবরদার এমনটি কখনো হতে পারে না। তাদের ধরা পড়ার আশংকা প্রকাশের উত্তরে এখানে كلا এর ন্যায় জোরালো ভাষায় তাকীদপূর্ণ শব্দ প্রয়োগই ছিল যথার্থ। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে তারা আল্লাহ্‌রই সাহচার্য থেকে বঞ্চিত ছিল। কাজেই "পরের শব্দ পূর্বপদে উল্লেখ করা সীমিত অর্থবোধক" ব্যাকরণের নিয়মের প্রেক্ষিতে হযরত মূসা (আ) বহুবচনের স্থলে معى (আমার সাথে) একবচন ব্যবহার করেছেন। উদ্দেশ্য—আমার পালনকর্তা আমারই সাথে রয়েছেন, দুর্বল ঈমানের দরুন তোমরা তাঁর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত। এখন বলুন—মহানবী (সা) হযরত মূসা (আ)-এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চাইলেও কি لا تحزن ان الله معنا বাক্যই প্রয়োগ করতেন ? অলংকারশাস্ত্রে সামান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্র আদৌ এটা সমর্থন করতে পারেন না। তিনি বাধ্য হবেন একথা বলতে যে, এ ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে মহানবী (সা)-কেও মূসা (আ)-এর ন্যায় একই বাকরীতিতে কথা বলতে হতো। এখন দেখুন, আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পরিণাম এমনি হয় যে, একজন নগণ্য শিক্ষার্থীও বিপরীত সম্ভাবনার যুক্তিতে বক্তার বক্তব্য বাতিল করে দিতে সক্ষম। এ জন্য মহানবীর ফযীলত বর্ণনায় বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করত সর্বদা নীতিগত আলোচনায় সীমিত থাকাই কর্তব্য।

—আররাফ'উ ওয়াল-ওয'উ, পৃষ্ঠা ৪৬

২৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রচলিত অর্থে আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ আখ্যা দেয়া চরম বেআদবী।

কেউ কেউ মহানবী (সা)-কে আল্লাহর প্রেমাস্পদ আখ্যা দেয়। কবিরা তো না'তে রাসূলের উপর বিভিন্ন ছন্দ রচনা করে। বস্তুত প্রেমিককে অস্থির করে তোলাই হলো ভালবাসার প্রতিক্রিয়া। অথচ আল্লাহ্ অস্থিরতা থেকে পবিত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন দুঃসাহসী এ অস্থিরতা আল্লাহ্‌র ব্যাপারেও প্রমাণের প্রয়াসী। এখানে জনৈক কবির ছন্দ লক্ষণীয়। তিনি বলেন ঃ

پے تسکین خاطر صورت پیرا هن یوسف

محمد کو جو بهیجا حق نے سایه رکه لیاقد کا

"মহান আল্লাহ তাঁর প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ প্রেমিক ছিলেন মহানবীর। সুতরাং প্রেমাস্পদের এ বিরহ জ্বালায় তিনি ছিলেন অস্থির-বেকারার, তাই সান্ত্বনার জন্য প্রেমাস্পদ মুহাম্মদের ছায়া তিনি আপনার কাছে রেখে দেন। হযরত ইয়াকুব যেমন ইউসুফের জামা রেখেছিলেন একই উদ্দেশ্যে।"

এটা মূলত না'ত তথা প্রশংসামূলক রচনা নয়, বরং আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে চরম বেআদবী। যা শুনাও গুনাহ আর এ ধরনের কথা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কোন কোন দীনদার ব্যক্তিও না'তে রাসূল বলতে আত্মহারা, এর বিষয়বস্তু শরীয়ত অনুযায়ী হোক বা নাই হোক। কোন কোন না'তে অন্যান্য নবীর প্রতিও এ ধরনের বেআদবীমূলক রচনা-ছন্দ লক্ষ করা যায়। মোটকথা, মহানবী (সা)-কে আল্লাহ্‌র মাশুক তথা ভালবাসার পাত্র সাব্যস্ত করাটা চরম ধৃষ্টতামূলক উক্তি। কারণ প্রেম একটা মানবীয় বৈশিষ্ট্য যদ্দ্বারা প্রেমিকের অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ্ এ থেকে পবিত্র। অবশ্য এটা বলা যায়, তিনি আল্লাহ্‌র মকবুল ও প্রিয় বান্দা। উপরন্তু প্রেম-ভালবাসাকে আল্লাহ্‌র সাথে রূপক অর্থে সম্পৃক্ত করাও বৈধ নয়, যেহেতু এটা শরীয়তের অনুমোদিত বিষয় নয়। অবশ্য কোন প্রেমাসক্ত ও মত্ত ব্যক্তির উক্তি হলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিবেকবানের বেলায় এটা অনুমোদনযোগ্য নয়। মোটকথা, সৃষ্টিকুলের পারস্পরিক রূপক প্রেম-ভালবাসাকে নৈকট্যকামী বান্দাদের সাথে জড়িয়ে মহান আল্লাহ্‌র সাথে তুলনা করা বৈধ নয়।

—তারজীহুল মুফসীদা, পৃষ্ঠা ১৮০, দাওয়াতে আবদিয়ত, ষষ্ঠ খণ্ড

৩০. মৃতদের রূহ্ দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে না।

সাধারণের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির রূহ্ দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে কারো ওপর ভর করা, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা প্রমাণসিদ্ধ নয়। যদিও কোন কোন বর্ণনায় এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কুরআনে কাফেরদের মরণোত্তর উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সে বলে থাকে ঃ

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَـرَكْتُ كَلاَّ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -

—কাফের বলবে—হে রব! পার্থিব জীবনে আমায় ফিরিয়ে দাও, ফেলে আসা সৎকর্মগুলি আমি সম্পাদন করি, (জবাব আসবে) হতেই পারে না, এটা একটা কথার কথা যা সে আওড়াবে শুধু আর তাদের পেছনে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত বরযখের অন্তরায়।

আলোচ্য আয়াতের আলোকে বোঝা যায় যে, মরণোত্তর জীবনে কাফেররা দুনিয়ায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করবে বটে, কিন্তু বরযখের ফলে তাদের সে আশা পূর্ণ হবার নয়। অধিকন্তু বিবেকের সাক্ষীও তাই। কেননা মৃত ব্যক্তি সেখানে সুখে থাকলে দুনিয়ার পংকিল আবর্তে সে মরতে আসবে কোন্ দুঃখে। আর আযাবে আবদ্ধ থাকলে পার্থিব সমাজে উপদ্রব আর বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ফেরেশতারাই বা ছাড়বেন কেন ? হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান নিযুক্ত রয়েছে। মৃত্যুর পর অবসরপ্রাপ্ত সে শয়তানই সম্ভবত কারো ওপর ভর করে মৃত ব্যক্তির নাম ভাঙ্গায়। অথবা ভিন্ন কোন শয়তানও হতে পারে। শয়তান সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يجرى من الانسان مجرى الدم او كما قال

—শয়তান মানুষের রক্তকণিকায় পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম।

মোটকথা, এসব কর্মকাণ্ড দুষ্টমতি জিন ও শয়তানের অপকর্ম। মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতিক্রিয়া বলে প্রচলিত ধারণা শুদ্ধ নয়। অবশ্য বলা যেতে পারে—প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য রূহের এখানে আসা জরুরী নয়, দূর থেকেও সম্ভব। জবাবে বলা হয়—এর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কেবল সম্ভাবনার ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সমর্থনে বিশুদ্ধ কোন দলীল উপস্থিত করা হয়।

—মুজাদালাতে মাদিলাত, পৃষ্ঠা ১৮, দাওয়াতে আবদিয়াত, সপ্তম খণ্ড

গায়রে মুকাল্লিদীনদের প্রশ্নের উত্তর

৩১. কিয়াস ও ইজতিহাদ বাতিল সন্দেহের অবসান।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্যতম মৌল ভিত্তি কিয়াস বাতিল হওয়ার সন্দেহ কারো মনে না আসাই উচিত। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করে যে, কিয়াসের নামে মূলত অনুমান ভিত্তিক বিষয়ের অনুসরণ করা হয় যা প্রমাণসিদ্ধ নয়। কেননা ইজতিহাদযোগ্য বিষয়টি স্বভাবতই 'যন্নী' যা অকাট্য দলীলে প্রমাণিত নয়। বিশেষত কুরআন শরীফেও যে ক্ষেত্রে 'ইত্তিবা যন্ন' তথা অনুমানভিত্তিক বিষয় অনুসরণের নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الله شيئا -

—তারা কেবল অনুমান-নির্ভর বিষয়েরই অনুসরণ করে অথচ অনুমানসিদ্ধ বিষয় আল্লাহ্র আযাব থেকে বিন্দুমাত্র রক্ষা করবে না।

আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—কিয়াসের বৈধতা শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং এটা শরীয়তসম্মত বিষয়, যার ওপর আমল করা ওয়াজিব। কাজেই এটা ما ليس لك به علم (যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই)-এর পর্যায়ভুক্ত নয়, বরং ما لك به علم (যে বিষয়ে তুমি অবহিত)-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা শরীয়তের প্রতিষ্ঠিত দলীল হিসেবে কিয়াসও ইলমের আওতাভুক্ত। অবশ্য কিয়াস সম্পর্কিত 'ইলম' প্রমাণসিদ্ধ না হওয়া সাপেক্ষে তার অনুসরণ অবশ্যই ما ليس لك به علم -এর আমলের পর্যায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু বিষয়টা তদ্রূপ নয়। কিয়াসের ওপর আমল করা মূলত ما لك به علم - এরই অনুসরণরূপে গণ্য হবে। উত্তমরূপে জেনে নিন যে, ' কুরআন শরীফের নিন্দিত যন্ন এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় পারিভাষিক 'যন্' এক বিষয় নয়, কুরআনের পরিভাষায় বরং 'যন' একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ। নিশ্চিত বাতিল এবং বিশুদ্ধ প্রমাণ বিরোধী বিষয়, উভয় ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সুতরাং পুনরুত্থান দিবসের অস্বীকারকারীদের বর্ণনায় ان نظن الا ظنا ব্যক্ত হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের অন্তরে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না, প্রাধান্য তো দূরের কথা বরং নিজেদের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে পুনরুত্থানকে তারা সত্যের পরিপন্থী মনে করত। তা সত্ত্বেও একে 'যন' তথা অনুমানই বলা হয়েছে। তাই বোঝা গেল কুরআনের পরিভাষায় 'যন' একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ। যা মিথ্যা ও বাতিলের উপরও প্রযোজ্য। অতএব যনের নিন্দাপূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে—

ان يتبعون الا ما خلف الدليل القطعى وكل ما خلف الدليل القطعى لا يغنى من الحق شيئا بل هو باطل قطعا -

—তারা কেবল অকাট্য প্রমাণ বিরোধী বিষয়েরই অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় অকাট্য দলীল বিরোধী বিষয়ের কোন মূল্য নেই বরং তা স্পষ্টত মিথ্যা ও বাতিল। সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারা সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। —তাত্হীরুল আ'যা, পৃষ্ঠা ১০

৩২. ইজতিহাদ রুদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব।

গায়রে মুকাল্লিদ মহলের মন্তব্য—"ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গেছে"-এ মর্মে হানাফীদের প্রতি ওহীর আগমন ঘটেছে কি ? জবাবে বলবো—প্রত্যেক জিনিস প্রয়োজন অনুপাতে হওয়াটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। যে ফসলের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন অধিক তাতেই বৃষ্টিপাতের চিরাচরিত বিধান। তদ্রূপ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই বায়ুর প্রবাহ আর শীতপ্রধান অঞ্চলে পশুর গায়ে পশমের আধিক্য লক্ষ করা যায়। এ জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে। তদ্রূপ হাদীস সংকলনের প্রয়োজন ছিল বলেই প্রাথমিক যুগে বিশ্ব বিশ্রুত প্রজ্ঞাবান মেধা ও ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্ম এবং বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু যুগ বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যময় ধারায়ই বর্তমানে তেমনটি হয় না। অন্যরা তো দূরের কথা স্বয়ং মুহাদ্দিসগণের মধ্যেও ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ন্যায় সনদসহ হাদীস মুখস্থ রাখার মত স্মরণশক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব বর্তমানকালে বিরল। একইভাবে ইসলামী বিষয়সমূহ সংকলন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই ইমামগণের মধ্যে ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনী শক্তি বর্তমান ছিল। এখন যেহেতু দীনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সংকলিত এবং নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত, কাজেই এখন ইজতিহাদের প্রয়োজন তখনকার তুলনায় নেই বললেই চলে। অবশ্যই প্রয়োজন অনুপাতে ইজতিহাদ করার যোগ্য ব্যক্তিত্ব বর্তমানেও বিরল নয়। (অর্থাৎ পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে নতুন নতুন প্রশাখাগত মাসআলা উদ্ভাবন করা।) —মুজদালাতে মা'দিলাত, পৃষ্ঠা ২৩, সপ্তম খণ্ড

৩৩. বর্তমান পরিবেশে দীনের হিফাযতের লক্ষ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণ (تقليد شخصى) অপরিহার্য।

একাধিক ব্যক্তির অনুসরণও মূলত জায়েয। যেমন কোন পীর সাহেবের নিকট থেকে কোন ওযীফা শিখে নেয়া, অপরজনের কাছ থেকে আরেকটি শিখা। এমনিভাবে একাধিক ব্যক্তিত্বের অনুসরণ মূলত জায়েয। পূর্ববর্তীগণের অবস্থা এই ছিল যে, কখনো তারা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করে নিতেন আবার কখনো ইমাম আওযাঈর নিকট সমাধান চাইতেন। তাদের এ অবস্থার অনুকরণে বর্তমানেও কারো কারো মনে এভাবে সমাধান লাভের অভিলাষ জাগে। কিন্তু মূলত এটা জায়েয হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিশেষ অন্তরায়ের দরুন তা নিষিদ্ধ। বিষয়টা পরিষ্কার বোঝার জন্য কিঞ্চিৎ ভূমিকার প্রয়োজন। তা হলো এই যে, সাধারণত বিজয়কালীন অবস্থাই বিচার্য হয়। সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্তমান অবস্থা এবং তৎকালীন পরিবেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তখনকার মানুষের মধ্যে দীনদারী প্রবল ছিল। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ঘটনাক্রমে তারা মাসআলা জিজ্ঞেস করত, যার রায়ে অধিকতর সতর্কতা রয়েছে বলে বিবেচিত হতো তার রায় অনুসারে আমল করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং যদি সে একই অবস্থা, একই মূল্যবোধ আজ বর্তমান থাকে, তবে ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ এখনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু অবস্থা তো এখন সে হালে স্থির থাকেনি। আর থাকবেই বা কিরূপে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ثم يفشو الكذب। অর্থাৎ উত্তম যুগের পর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষের অবস্থায় পরিবর্তন দেখা দেবে। তাই ইসলামের সর্বোত্তম যুগ থেকে দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের অবস্থা ততই খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখনকার স্বাভাবিক অবস্থা হলো—মতলব আর স্বার্থ উদ্ধার করা। আজকাল বিভিন্ন জনের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এই—যার মতে মতলব পুরা হয় তার ওপরই আমল করব। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক লোকের বিয়ে হলে পর জানা গেল স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শিশু অবস্থায় জনৈকা মহিলার দুধ পান করেছিল। এদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এসে আমার নিকট জানতে চাইল—এখন কি করা যায় ? আমি বললাম ঃ তাদের বিয়ে জায়েয নয়, বিচ্ছিন্ন করে দেয়া জরুরী। সে বলতে লাগল, এটা তো খুবই দুর্নামের কথা, বৈধতার কোন উপায় বের করেই দিন। আমি বললাম ঃ প্রথমত বিচ্ছেদের মধ্যে দুর্নাম নয়, বিচ্ছেদ না করাতেই বরং কলংক। কেননা মানুষ বলবে, দেখ, ভাই-বোনের দম্পতি বানিয়ে রেখেছে। দ্বিতীয়ত বদনাম যদি হয়ই তো হোক। শরীয়তের যখন এই হুকুম, তখন দুর্নামের কোন পরোয়া থাকতে পারে না। সে বলতে লাগল, সে তো পান করার পর বমিও করে ফেলেছিল। আমি বললাম ঃ বমি করুক বা না করুক হারাম হওয়ার ব্যাপারে একই কথা। আমার তরফ থেকে এরূপ পরিষ্কার জবাবের পর লোকটি দিল্লী পৌঁছে। সেখানে জনৈক আহলে হাদীসের সাথে তার সাক্ষাত হয়। কারো প্রতি কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং তার মতলব সিদ্ধি করার অবস্থা ব্যক্ত করাই আমার লক্ষ্য। মোটকথা, মতলবের গরযে সে আহলে হাদীসের নিকট উপস্থিত হয় যে, সম্ভবত এখানে কোন উপায় করা যাবে। তথাকথিত

হাদীসপন্থী লোকটি তাকে বলল, পাঁচ চুমুকের চাইতে কম পান করে থাকলে হারাম সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তিনি এ মর্মে এক ফতোয়া জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিলেন যে, একটি ছেলে শিশুকালে জনৈকা মহিলার দুই চুমুক দুধ পান করেছিল, অতএব উক্ত মহিলার মেয়ের সাথে ছেলেটির বিয়ে জায়েয হবে কি-না ? সুতরাং তিনি জবাব লিখে দিলেন— لا تحرم المصة ولا المصتان অর্থাৎ এক চুমুক বা দুই চুমুক দুধ পান করা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় না। লোকটি বড়ই খুশি হয়ে উক্ত ফতোয়া স্বামী-স্ত্রীর সামনে এনে উপস্থিত করল। ভাবখানা এই—এটাও তো আলিমেরই দেয়া ফতোয়া, এ ফতোয়ার ওপর আমল করাতে দোষের কি আছে ? যাহোক, আমি বলেছিলাম যে, আজকাল মানুষের মধ্যে এ ধরনের স্বার্থবাদী মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত, মিঞা! শিশু কয় চুমুক পান করছে তুমি কি বসে বসে গণছিলে? যদি ধরে নেয়া হয় চুমুকের সংখ্যা তার জানা ছিল, তাহলে এর ভিত্তিতে যারা বলছে হালাল তাদের ফতোয়া তো মেনে নেয়া হলো কিন্তু হারাম ফতোয়াদানকারীদের ফতোয়া অগ্রাহ্য করা হলো। অথচ হালাল ফতোয়াদানকারী ব্যক্তি তার মাযহাবভুক্ত লোকও ছিল না। তবে হ্যাঁ, প্রথম থেকে সেও যদি এ মাযহাবেরই অনুসারী থাকত, তবে কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সে তো তাদের মাযহাবভুক্ত ছিল না। ভিন্ন মাযহাবে স্বার্থের আলামত লক্ষ করেই তাতে সে ভিড়ে গেছে। অতএব দীনের ওপর পার্থিব স্বার্থকেই সে প্রাধান্য দিল। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো—কোন কোন আলিমও এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত যে, ইজতিহাদযোগ্য ও বিরোধপূর্ণ মাসআলায় অন্য ইমামের রায়ের ওপর আমল করাতে দোষের কি আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) انما الاعمال بالنيات বাণী দ্বারা এর মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, নিয়তের ওপরই আমলের ফলাফল নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল অন্য ইমামের মাযহাবের ওপর দীন হিসেবে আমল করা হয় না বরং পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে এরূপ করা হয়। আল্লামা শামী বর্ণনা করেছেন—জনৈক ফকীহ্ একজন মুহাদ্দিসের নিকট তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কন্যার পিতা উক্ত ফকীহ্কে জবাব দিলেন, বিয়ে দিতে রাযী, কিন্তু শর্ত হলো, রাফএ ইয়াদাইন ও আমীন বিল-জিহ্র করতে হবে।[১] যাহোক শর্ত মোতাবিক প্রস্তাবিত মুহাদ্দিস-কন্যার সাথে উক্ত ফকীহ্র বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কোনও বুযুর্গের সামনে ঘটনা বর্ণনা করা হলে শোনার পর কিছুক্ষণ অধোমুখে মৌন থাকার পর তিনি বললেন ঃ লোকটির ঈমান চলে গেছে বলে আমার আশংকা হয়। কেননা ইতিপূর্বে যে

১. নামাযের মধ্যে দুই হাত ওঠানো এবং সূরা ফাতিহা শেষে জোরে আমীন বলাকে যথাক্রমে রাফ'-এ ইয়াদাইন ও আমীন বিল-জিহ্র বলা হয়।

আমলটি সে সুন্নত মনে করে পালন করত, শরীয়তের কোন দলিল ছাড়াই কেবল দুনিয়াবী গরজে স্বীয় মাযহাব বর্জন করছে। এই হলো মানুষের স্বার্থবাদী চিন্তার বাস্তব চিত্র। এমতাবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণকে (تقليد شخصى) যদি অপরিহার্যতার মর্যাদা দেয়া না হয়, তবে অবস্থা এই দাঁড়াবে, প্রত্যেক মাযহাব থেকে সবাই যার যার সুবিধাজনক মাসআলাই গ্রহণ করবে। যথা—ওযূ করার পর রক্ত বের হলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুসারে ওযূ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব অনুসারে নষ্ট হয় না। অতএব এখানে সে শাফিঈ মাযহাব গ্রহণ করবে। কিন্তু ওযূ অবস্থায় সে যদি স্ত্রীর গায়েও হাত লাগায়, তবে শাফিঈ মাযহাব মতে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুসারে নষ্ট হবে না। তাই এক্ষেত্রে সে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করবে। অথচ অবস্থা এই যে, এমতাবস্থায় কোন ইমামের মতেই ওযূ বহাল থাকবে না। ইমাম আবূ হানীফার মতে তো রক্ত প্রবাহের দরুন আর ইমাম শাফিঈর মতে স্ত্রীকে ছোঁয়ার কারণে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু স্বার্থের মোহে কোন পরোয়াই তার থাকবে না, নির্ভয়ে সে প্রত্যেক ইমাম থেকে মতলবের অনুকূল মতটাই গ্রহণ করবে আর স্বার্থবিরোধী রায় পরিত্যাগ করবে। অতএব দীন তো নয়, থাকবে কেবল মতলবের ধান্ধা। এই হলো আমাদের এবং পূর্ববর্তীগণের মধ্যকার ব্যবধান। তাদের মধ্যে ছিল তাক্ওয়া ও দীনদারীর প্রাধান্য, তাদের আচার-আচরণে স্বার্থ ও মতলবের বালাই ছিল না। পক্ষান্তরে আমাদের মন-মস্তিষ্ক স্বার্থবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন, আমরা ব্যক্তিস্বার্থে নিমগ্ন এবং মতলবের গোলাম। কাজেই আমাদের জন্য "তাক্লীদে শাখ্সী" তথা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণের প্রয়োজন অধিক। অবশ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাক্লীদকে মৌলিকভাবে ফরয-ওয়াজিব বলি না বটে, কিন্তু এর দ্বারা দীনের সংরক্ষণ সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হয়। আর তাক্লীদ বর্জন করাতে দীনের সংরক্ষণ নস্যাৎ হয়ে যায়। উপরন্তু তাক্লীদ বর্জিত অবস্থায় সকল মাযহাবের মধ্য হতে অধিকতর সতর্কপূর্ণ বিষয়টি সন্ধান করে আমল করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এতে বিপদের মাত্রা শুধু বাড়িয়ে তোলাই সার। আর অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়ের অনুসন্ধান করাটা স্বার্থপরতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। অতএব তাক্লীদ করার মধ্যেই শান্তি, তদুপরি নফসের পূর্ণ হিফাযতের নিশ্চয়তা বিদ্যমান। মুজতাহিদগণের মধ্য হতে ব্যক্তি বিশেষের তাক্লীদের ন্যায় নিজের অনুসৃত মাযহাবের নির্ভরযোগ্য আলিমগণের মধ্য হতে কোনও একজনকে অনুসরণীয় সাব্যস্ত করার মধ্যেও একই হিকমত ও উপকারিতা নিহিত। কেননা যুগের পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। বর্তমানে চলছে মতলব আর স্বার্থের দৌরাত্ম্য। দ্বিতীয়ত একই মাযহাবভুক্ত আলিমগণের মধ্যেও

বিভিন্ন মাসআলায় মতবিরোধ বিদ্যমান। তাই অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনও একজনকে নির্দিষ্ট না করার মধ্যে স্বার্থের বেড়াজালে আট্কে পড়ার সমূহ আশংকা থেকেই যায়। অধিকন্তু "নিজের পছন্দমত আলিমের রায় মেনে নিল আর অন্যদের অভিমত পরিত্যাগ করা হলো" এ-অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকে না।

—ইত্তিবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ৩৪

৩৪. "মুকাল্লিদগণ হাদীসের পরিবর্তে ইমামগণের রায়ের ওপর আমল করে"—এ অভিযোগের জবাব।

ইমামগণের তাকলীদের ব্যাপারে কোন কোন মুকাল্লিদ এত গোঁড়ামিতে লিপ্ত যে, ইমামের উক্তির বিপরীত সহীহ্ হাদীসকে সে নির্ভয়ে রদ করে দেয়।

এ কথা চিন্তা করলে আমার তো শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। এ ধরনের এক ব্যক্তির মন্তব্য হলো ঃ

قال قال بسیار است
مرا قال ابو حنیفه درکار ست

অর্থাৎ কালা কালা তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস তো কতই আছে, কিন্তু আমার প্রয়োজন কেবল আবূ হানীফার উক্তি। এ বাক্যের অন্তরালে রাসূল (সা)-এর হাদীসের প্রতি চরম ধৃষ্টতা ও বে-আদবী প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ এ জাতীয় গোঁড়ামি থেকে রক্ষা করুন। এদের ভাব-ভঙ্গি দ্বারা প্রমাণ হয় ইমাম আবূ হানীফাই যেন তাদের মূল অনুসরণীয়। তাহলে এ তাকলীদকে কেউ যদি "নবুয়তের শরীক" বলে আখ্যায়িত করে তাতে তার অন্যায়টা কি হবে ? কিন্তু দু-চারজন মূর্খের অবস্থা ভিত্তি করে সমস্ত মুকাল্লিদকে "নবুয়তের শিরকে লিপ্ত" বলে অভিযুক্ত করাটাও ভুল কথা। আল্লাহ্ না করুন সমস্ত মুকাল্লিদ এরূপ কেন হবেন। আমার অন্তরে তাকলীদের অর্থ হলো—আমরা ইমাম আবূ হানীফার ব্যাখ্যা অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের ওপর আমল করে থাকি। কেননা আমাদের মতে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ আসনে আসীন, এটা সর্বজন স্বীকৃত কথা। তাঁর ফকীহুল উম্মত হওয়াটা গোটা উম্মত কর্তৃক স্বীকৃত, তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানই এর প্রমাণ। এখন বলুন—এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাকলীদের মধ্যে "নবুয়তের শিরকের" অর্থ কোত্থেকে ঢুকল ? বস্তুত তাকলীদের এ অর্থে বিশ্বাসী ব্যক্তির মূল উদ্দেশ্য হাদীসের ওপর আমল করা আর ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের সঠিক মর্ম বোঝার উসীলা বা মাধ্যম মাত্র। যে ব্যক্তি কোন মাধ্যম ছাড়াই হাদীসের ওপর আমল করার দাবিদার আসলে সে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদীসের আনুগত্য করার অনুশীলন করে। এটা নিশ্চিত

যে, "সালফে সালেহীন" তথা আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের জ্ঞান-বুদ্ধি, তাকওয়া-পরহেযগারী, খোদাভীতি, আমানতদারী ও সতর্কতা ছিল আমাদের এবং আপনাদের অপেক্ষা অনেক গভীর, তীব্র সংবেদনশীল। তাহলে বলুন, হাদীসের ওপর পূর্ণাঙ্গ আমল কার হচ্ছে, নিজ জ্ঞানে হাদীসের ওপর আমলকারী আপনার, না-কি 'সলফের' (পূর্ববর্তীগণের) মাধ্যমে হাদীসের অনুসারী মুকাল্লিদের ? এর ফয়সালার ভার ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের বিবেকের ওপর ন্যস্ত রইল।

যাহোক, তাকলীদের যে ব্যাখ্যা আমি ব্যক্ত করেছি সে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান যা স্মরণ রাখার মত। আহলে হাদীসগণ আমাদের প্রতি অপর এক প্রশ্নের অবতারণা করে যে, আপনাদের সামনে কোন হাদীস পেশ করা হলে সে অনুপাতে আমল করতে আপনারা কেবল এ কারণে অস্বীকার করে থাকেন যে, আপনাদের ইমামের রায় এর বিপরীত। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাদীসের অনুসরণ আপনাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং ইমামের তাকলীদ করাটাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়।

এর জবাব হলো—বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মূলে একাধিক হাদীস বর্ণিত থাকে। আপনাদের উদ্ধৃত হাদীসের ওপর যদিও আমাদের আমল নেই, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের আমল অন্য হাদীসের ওপর যা আপনাদের নিকট স্বীকৃত নয়। তাহলে অভিযোগ কেবল আমাদের একার ওপর নয় আপনাদের ওপরও বর্তায়। বাকি রইল আপনাদের অপর দাবি যে, আমাদের পক্ষের হাদীস প্রাধান্যের অধিকারী (راجح) আর আপনাদের হাদীসের প্রাধান্য স্বীকৃত নয় (مرجوح)। জবাবে বলবো—প্রাধান্য দেয়ার পদ্ধতি মূলত রুচিনির্ভর বিষয়। আপনাদের অভিরুচি অনুযায়ী একটি হাদীস হয় তো প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার অনুসন্ধান মতে হয় তো প্রাধান্য রয়েছে অপর হাদীসের। আর আমাদের দৃষ্টিতে ইমাম সাহেবের অনুসন্ধান ও প্রজ্ঞা আপনাদের রুচি ও প্রজ্ঞা অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর পরও নিজেদেরকে তোমরা হাদীসের ওপর আমলকারী বলে দাবি করা আর তাকলীদপন্থীদের হাদীসের ওপর আমলকারী স্বীকার না করাটা নিতান্ত গোঁড়ামি। এ কথাটাকেই ভিন্নতর ভঙ্গিতে আমি ব্যক্ত করতে চাই যে, "আমল বিল-হাদীস" তথা হাদীসের ওপর আমল করার অর্থ কি ? এর দ্বারা কি সমস্ত হাদীসের ওপর আমল বোঝায়, না কি কোন কোন হাদীসের উপর ? যদি বল—এর অর্থ সমস্ত হাদীস, তাহলে এটা তোমাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। কেননা বিপরীত অর্থবোধক হাদীসের সবগুলির ওপর আমল করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই কোন একটি হাদীসের ওপর আমল করে অপরগুলিকে বর্জন করতেই হবে। আর যদি এর অর্থ হয়—কোন কোন হাদীসের ওপর আমল করা, তাহলে এ অর্থে আমরাও আহলে হাদীস বা হাদীসের ওপর আমলকারী। সুতরাং এ

যুক্তি বলে তোমরাই কেবল আহলে হাদীস হওয়ার দাবি করা অসার ও ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়ত, মানসূস (সরাসরি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত) মাসআলা সংখ্যায় অতি নগণ্য, অধিকাংশ মাসআলাই ইজতিহাদী। সেগুলোতে আহলে হাদীসগণও হানাফী কিতাব থেকে ফতোয়া দেয়, আমল করে অথবা অন্য কোন ইমামের রায়ের ভিত্তিতে আমল করে। অতএব বেশির ভাগ মাসআলায় তোমরাও মুকাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে বলতে হয়—তাকলীদ করাতো হারাম নয় তাকলীদের নাম নেয়াটাই কেবল নাজায়েয ও শিরক। কথাটা কেমন যেন হাস্যকর শোনায়। কেউ যদি দাবি করে যে, সকল মাসআলাতেই সে মানসূস হাদীসের ওপরই আমল করে ও ফতোয়া দেয়, তবে পরস্পর লেনদেন, মুআমালা, বেচা-কেনা, চুক্তি করা, বাতিল করা, শোফআ, রেহন ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন রাখার অনুমতি দেয়া হোক আর সে সহীহ্ হাদীস দ্বারা এর জবাব দেবে। কিয়ামত পর্যন্ত হাদীস দ্বারা জবাব দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এখন সে হয় কোন ইমামের কওল বা উক্তি দ্বারা জবাব দিবে, তবে তো সে তাকলীদই হলো। অথবা বলবে—শরীয়তে এ মাসআলার কোন হুকুম বর্ণিত নেই, তাহলে এটা হবে– اليوم اكملت لكم دينكم (আজ তোমাদের দীনকে আমি পূর্ণতা দান করলাম) আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। বস্তুত এর দ্বারাই কিয়াস বা উদ্ভাবন-শাস্ত্রের বৈধতা প্রমাণ হয়। কেননা "দীনকে আমি পূর্ণতা দান করেছি" খোদায়ী বাণীর প্রেক্ষিতে শরীয়তে হুকুম বর্ণিত হয়নি এমন কোন মাসআলার অস্তিত্ব না থাকা অনিবার্য। বলা বাহুল্য, মানসূস হুকুমের সংখ্যা অতি নগণ্য। অতএব এমতাবস্থায় দীনের পূর্ণতার একমাত্র উপায় এই যে, কিয়াস ও ইস্তিম্বাতের (উদ্ভাবন) বৈধতা স্বীকার করে নেয়া। অর্থাৎ "গায়রে মানসূস" মাসআলাসমূহ মানসূস মাসআলার সাথে তুলনা করে হুকুমের পরিচয় লাভ করা। এর দ্বারা কিয়াস ও ইস্তিম্বাতের বৈধতা পুরোপুরি অস্বীকার করে কেবল হাদীসের ওপর আমলের দাবিদারদের ভ্রান্তিও স্পষ্টত প্রমাণ হয়। অবশ্য কোন কোন হাদীসে কিয়াসের নিন্দাও করা হয়েছে, কিন্তু সেটা শরীয়তের নীতিমালা ভিত্তিক কিয়াস নয় বরং এ হুকুম ইসলামী নীতি পাশ কাটিয়ে বানোয়াট নীতিকেন্দ্রিক কিয়াসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নতুবা দীনের মধ্যে ত্রুটি আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে। —ইরযাউল হক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২

৩৫. আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে বুযুর্গানে দীনের বুযুর্গীর ওসীলা গ্রহণের কার্যকারিতা কতটুকু ? এ প্রশ্নের উত্তর।

এ পর্যায়ে বুযুর্গানে দীনের ওসীলা গ্রহণের প্রচলিত ধরন অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! অমুক বুযুর্গের ওসীলায় আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন"-এর আসল মর্ম এই যে, হে আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিতে অমুক আপনার মকবুল বান্দা আর আপনার প্রিয়জনকে ভালবাসা দ্বারা আপনার রহমত পাওয়ার ওয়াদা রয়েছে। সুতরাং তাঁর ওসীলায় আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। অতএব দেখা যায় সে ব্যক্তি ওয়ালীআল্লাহগণের প্রতি নিজের ভালবাসার ওসীলা উদ্ধৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত ও সওয়াব কামনা করছে। আর আল্লাহওয়ালাগণের সম্পর্কে অন্তরে ভালবাসার ভাব পোষণ করা যে আল্লাহ্র রহমত লাভ এবং সওয়াবের কারণ হয় একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মহব্বতকারীদের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। কাজেই বুযুর্গানে দীনের বুযুর্গী ও বরকত আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে কতটুকু কার্যকর এ প্রশ্ন এখন অবান্তর। বস্তুত এর কার্যকারিতা এতটুকুই যে, কোন বুযুর্গের প্রতি ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা মূলত আল্লাহকে ভালবাসার অংশবিশেষ যার ওপর সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। এ ব্যাখ্যার পর اما بنعمة ربك فحدث (তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা তুমি জানিয়ে দাও) আয়াতের মর্মানুযায়ী মহান আল্লাহ্র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি বলতে চাই যে, এ বক্তব্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া যদি শুনতেন, তবে তাঁর পক্ষে ওসীলা গ্রহণের বৈধতা অস্বীকার করার আদৌ কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। যেহেতু এর ভূমিকা সবই সহীহ ও শুদ্ধ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সাহায্য-সহায়তার ফরিয়াদ জানিয়ে সমকালীন জাহিলদের শরীয়তবিরোধী ওসীলা গ্রহণ থেকে লোকদের বারণ করাই ছিল আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার আসল উদ্দেশ্য।

—আকবারুল আমাল, পৃষ্ঠা ৭

৩৬. "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ব্যতীত সকল প্রকার যিক্‌র বিদ'আত"—এ সন্দেহের অবসান।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ছাড়া সমস্ত যিক্‌র বিদ'আত ও ভিত্তিহীন। কেননা এগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তখন আমি উপস্থিত থাকলে আদবের সাথে আলিমদের নিকট এই মর্মে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতাম যে, এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে اذا السماء انفطرت -এর শব্দগুলি বিচ্ছিন্নভাবে প্রথমে اذا السماء ن - اذا السماء ن অতঃপর فطرت - فطرت কণ্ঠস্থ করার পর পুনরায় اذا السماء انفطرت যুক্তভাবে পাঠ করে। এমতাবস্থায় তার এ নিয়মে মুখস্থ করা জায়েয কি-না ? সন্দেহের কারণ এই যে, اذا السماء এবং فطرت বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উভয়টি অর্থহীন শব্দ। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি ইমাম ইবনে তাইমিয়া একে অবশ্যই জায়েয বলতেন। আর এর কারণ এই ব্যাখ্যা দিতেন যে, মূলত এটা তিলাওয়াত নয় এবং তিলাওয়াত করা সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যও নয়; বরং তার উদ্দেশ্য

হলো মুখস্থ করা। আমি বলব—তাহলে الا الله - الا الله ও الله - الله বলাটা বিদ'আত হবে কোন্ কারণে ? এখানেও তো আল্লাহ্‌র যিক্‌রকে অন্তরে বদ্ধমূল করাই উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞতার আলোকে আমি দাবি করে বলতে পারি যে, যিক্‌রকে বদ্ধমূল করার জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ যা কারো পক্ষে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। সন্দেহ থাকলে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এখন যদি কেউ বলে যে, সে কুরআন মুখস্থকারী যেরূপ তিলাওয়াতকারী নয় বরং তিলাওয়াতের প্রস্তুতি গ্রহণকারী মাত্র, অনুরূপ এমতাবস্থায় সেও যিক্‌রকারী নয়, যিক্‌রের প্রস্তুতি গ্রহণকারী মাত্র। তাহলে আমি বলব—নামাযের অপেক্ষায় থাকা যেমন নামাযেরই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত সেও তদ্রূপ যিক্‌রকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ইবনে তাইমিয়ার নিকট কথাটা এভাবে ভূমিকা দিয়ে কেউ ব্যাখ্যা করেনি। যার ফলে তিনি এটাকে বিদ'আত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। অধিকন্তু তাঁর নিকট জাহেল সূফীদের ভ্রান্তিপূর্ণ ভূমিকাই তুলে ধরা হয়েছিল। কেউ তাঁর সামনে قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون (বল, আল্লাহ্‌ই, অতঃপর তাঁদেরকে নিজেদের অর্থহীন আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও) দ্বারা এর দলীল পেশ করেছিল, যার দরুন তিনি সূফীদের সমালোচনায় কড়া মন্তব্য করেছিলেন। বস্তুত এর দ্বারা দলীল হয়ও না। কেননা এ আয়াতে الله শব্দটি قل -এর 'মাকূলা' (বক্তব্য) নহে। কারণ আরবী বাকধারা অনুসারে 'কওল' (قول) ধাতু নিঃসৃত পদের 'মাকূলা' বা বক্তব্য একক পদ নহে বরং বাক্য হয়ে থাকে। বস্তুত আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহ্' (الله) পদটি انزل অদৃশ্য ক্রিয়ার কর্তা বিশেষ। আয়াতের প্রথমাংশে এর নিদর্শন বিদ্যমান। বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاؤُكُمْ قُلِ اللّٰهُ اَىْ قُلْ اَنْزَلَ اللّٰهُ -

—বল, তবে মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল তা তোমরা কিছু কাগজে লিখ কিছু প্রকাশ কর আর অধিকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা জানতে না তা-ও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা কে নাযিল করেছিল ? বল, আল্লাহ্‌ই অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই নাযিল করেছেন।

—সূরা আনআম, ৯১ আয়াত

কোন অজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো এর দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকবে, যার ফলে ইবনে তাইমিয়া তীব্র সমালোচনার সুযোগ পেয়ে যান। কিন্তু হাতুড়ে চিকিৎসকের ভুলের

দরুন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা জায়েয হবে না। আর উভয়কে একই কাতারে শামিল করা বিবেকসম্মতও হতে পারে না। মুহাককিক আলিমগণের দলীল শোনার সুযোগ হলে ইবনে তাইমিয়ার পক্ষে সূফীগণের ধ্যান-ধারণা অস্বীকারের দুঃসাহসই হতো না। মোটকথা, যিক্‌রের এক স্তর হলো আল্লাহ্‌র নাম আবৃত্তি করা, দ্বিতীয় স্তর হলো নামের মাধ্যমে তাঁর সত্তাকে আবৃত্তি করা, আর তৃতীয় পর্যায়ে এই যে, নামের মাধ্যম ছাড়াই খোদায়ী সত্তার আবৃত্তিতে যোগ্যতার পর্যায়ে উপনীত হওয়া।

—আকবারুল আমাল, পৃষ্ঠা ২৭

৩৭. হানাফী বলাটা আপত্তিকর হওয়ার জবাব।

এ পর্যায়ে মহান আল্লাহই আনুগত্যের মূল আধার। রাসূল, সাহাবী এবং মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্যের অর্থ এই যে, এদের দিক-নির্দেশনার আলোকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করা। কাজেই এ অর্থে 'হানাফী' আর 'মুহাম্মদী' বলা বৈধ-অবৈধ হওয়াতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই সম্পৃক্তির উদ্দেশ্য মৌলিক আনুগত্য নেয়া হলে উভয় ক্ষেত্রে এটা না-জায়েয হবে। কারণ এ জাতীয় আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু এ সম্পৃক্ততার অর্থ যদি হয় এদের পথ-প্রদর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য প্রদর্শন করা তাহলে এ অর্থের প্রেক্ষিতে উভয় স্থানে এর প্রয়োগ বিশুদ্ধ। তাহলে একটি জায়েয আর অপরটি না-জায়েয হওয়ার কারণ কি ? সুতরাং বোঝা গেল 'হানাফী' বলাতে দোষের কিছু নেই। 'হানাফী' সম্পৃক্তিকে কুফর ও শিরক আখ্যা দেয়া একটা ভ্রান্তিমূলক কথা। যেহেতু এ সম্পৃক্ততা দ্বারা মৌলিক ইত্তেবা কিংবা আনুগত্য উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্য হলো—আমরা এদের তাহকীক বা গবেষণা-অনুসন্ধান মূলে আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য প্রকাশ করি। ইমাম আবূ হানীফা কর্তৃক উদ্ভাবিত শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই যে, তিনি আমাদের অপেক্ষা বিশুদ্ধ মাত্রায় দীন ও ইসলামকে অনুধাবন করেছেন। তাই আমরা তাঁর সমাধানের আনুগত্যের আশ্রয় নিয়ে থাকি। কিন্তু মৌলিকভাবে তাঁর আনুগত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। ইমাম আবূ হানীফার প্রতি আমাদের সম্পৃক্ততার অনুরূপ আল্লাহ্‌র কালামেও অন্যের প্রতি অভিন্ন প্রকৃতির নিসবত বা সম্পৃক্তকরণের বিদ্যমানতা লক্ষ করা যায়। সুতরাং কুরআনের ভাষায় ঃ واتبع سبيل من اناب الى (অর্থাৎ এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর) এবং قل هذه سبيلى ادعوا الى الله (অর্থাৎ, বল, এটিই আমার পথ। আর আমি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহবান করি...)।

আলোচ্য আয়াতে 'সাবীল' শব্দের সম্পৃক্ততা রাসূল ও আল্লাহ্‌র অনুসারী বান্দার প্রতি করা হয়েছে। আর يصدون عن سبيل الله (তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে

রাখে) আয়াতে 'সাবীল' শব্দের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে দেখানো হয়েছে। এটা কবির ভাষায় যেন– عباراتنا شتى و حسنك واحد (আমাদের ভাষা বিভিন্ন কিন্তু রূপ তোমার অভিন্ন) এবং

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش

من بهر انداز قدرت می شناسم

—"পরিচ্ছদ তোমার যাই থাকুক আকৃতির আন্দাজেই তোমার পরিচয় আমি পেয়ে যাই" ছন্দের অনুরূপ।

আসল কথা হলো—যার অন্তরে ভালবাসা বর্তমান যে কোন অবস্থায় প্রেমাষ্পদের পরিচয় সে জেনেই নেয়। তদ্রূপ দীনকে যারা সঠিক অর্থে বুঝেছে তাদের সামনে দীন কুরআনের আকারে আসুক কিংবা হাদীসের আবরণে তারা উপরোক্ত ছন্দই আবৃত্তি করতে থাকে। কেবল শিরোনাম পরিবর্তনের দরুন কেউ কেউ হাদীসকে আবার কেউ ফিকাহ্‌কে কুরআনের সংজ্ঞা থেকে খারিজের প্রয়াস চালিয়েছে অথচ মূলত এসব একই জিনিস। উদাহরণ এরূপ যেমন—একটা লক্ষ্ণৌর চিকিৎসালয়; আরেকটা দিল্লীর চিকিৎসা কেন্দ্র বলা হয়, কিন্তু মূলে উভয়টি ইউনানী দাওয়াখানা বলে পরিচিত। তদ্রূপ কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ ইত্যাদিতে যদিও আনুষঙ্গিক ও শাখা-প্রশাখায় বিভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু মূলে সব একই দীনে ইসলাম। শাখা-প্রশাখায় যদি অল্প বিস্তর মতবিরোধ হয়েই যায়, তবে কি তা দীনে ইসলামের অন্তর্ভুক্তই থাকবে না? যেমন দিল্লী-লক্ষ্ণৌর চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্যের দরুন সেগুলি ইউনানী দাওয়াখানার অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত; কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ ইত্যাদির বেলায়ও একই নীতি প্রযোজ্য। সার কথা, আল্লাহ্ যাকে 'সাবীলী' (আমার পথ) আখ্যা দিয়েছেন সেটিকেই এখানে সাবীলা মান আনাবা ইলাইয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং প্রয়োগ হিসেবে 'সাবীলী' এবং "সাবীলা মান আনাবা ইলাইয়া" অভিন্ন প্রকৃতির। একইভাবে এক স্থানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها

—আমি তোমাকে দীনের বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি তুমি তার অনুসরণ কর। অন্যত্র বলেছেন ঃ

اتبع ملة ابراهيم حنيفا [অর্থাৎ তুমি মিল্লাতে ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ কর।] তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়ায়? বলা বাহুল্য, মিল্লাতে ইবরাহীম (আ) শরীয়তে মুহাম্মদীরই অপর নাম। আসলে এটা কেবল শিরোনামের বাহ্যিক বিভিন্নতা। নতুবা মূল আনুগত্য তো আল্লাহ্‌র হুকুমেরই। তাহলে আলিমদের অনুসরণের নাম শুনে আঁতকে ওঠার কি আছে।

মহানবী (সা) পূর্ণাঙ্গ নবী হওয়া সত্ত্বেও বলা হয়েছে—

واتبع ملة ابراهيم

"মিল্লাতে ইবরাহীমের ইত্তেবা কর।" এ কথার অর্থ যদি তাঁর তরীকার অনুসরণ করা হয় তাহলে তো বড় সাংঘাতিক কথা। কেননা অপরের তরীকার অনুসরণ করা উম্মতের কাজ তা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বোঝা গেল মিল্লাতে ইবরাহীমী মূলত মিল্লাতে ইলাহীরই অপর নাম। কেননা মিল্লাতে ইলাহী বস্তুত বিভিন্ন উপাধিতে বিভূষিত। তন্মধ্যে মিল্লাতে ইবরাহীমও একটি। উক্ত শরীয়তদ্বয় শাখা-প্রশাখা বা খুঁটিনাটি বিষয়ে বহু ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতির ধারক। তাই এ প্রেক্ষিতে মুহাম্মদী শরীয়তকে মিল্লাতে ইবরাহীমী নামে অভিহিত করা হয়। অতএব বাস্তবে এটা মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণ নয় বরং মিল্লাতে ইলাহিয়ারই অনুকরণ। অবশ্য অন্য এক কারণে একে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এখানে মিল্লাতে ইলাহিয়াকে মিল্লাতে ইবরাহীম বলা হয়েছে। অনুরূপ একই দীনকে যদি শাফিঈ মাযহাব, হানাফী মাযহাব অথবা কাযী খানের অভিমত বলা হয়, তবে ক্ষতির কি আছে। লোকেরা বলে–এতো মাওলানাদের ফতোয়া, আল্লাহ-রাসূলের হুকুম থোড়াই। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা আলিমদের ফতোয়া নয় বরং খোদার পক্ষ থেকে বর্ণিত মাসআলা। মাওলানা সাহেব তার মর্ম জেনে দিক-নির্দেশ করেছেন মাত্র। এর দ্বারা আরো বোঝা গেল যে, কিয়াস অন্তর্নিহিত বিষয়টিকে প্রকাশ করে মাত্র, নতুনভাবে প্রমাণ করে না। সুতরাং এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে মহানবী (সা)-এর পর আলিমদের অনু-করণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কবির ভাষায় ঃ

چونکه شه خورشید ومارا کرد داغ

چاره نبود در مقا مش جزچراغ

অর্থাৎ সূর্য ডুবে গেলে প্রদীপ ছাড়া আলো পাওয়ার দ্বিতীয় উপায় অকল্পনীয়। তদ্রূপ সাহেবে ওহী তথা নবী করীম (সা) দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া অবস্থায় আলিমগণের অনুসরণ ছাড়া আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে? যেমন কবি বলেছেন ঃ

چونکه گل رفت گلستان شد خراب
بوئے گل را از که جویم از گلاب

—ফুল ঝরে গেছে, ফুল বাগিচা বিরাণ পড়ে রয়েছে, তাই গোলাপের সুগন্ধি আমি কোথায় তালাশ করব।

আলোচ্য ছন্দটি অবশ্য এক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কেননা শরীয়তের ফুলবাগিচার সজীবতা চির অম্লান, চির অক্ষুণ্ন। কিন্তু এখন যেহেতু নবী আমাদের সামনে অনুপস্থিত, কাজেই দীন ঐ সব ব্যক্তি থেকেই হাসিল করা বাঞ্ছনীয় যারা নবীর ফয়েয-বরকতে ধন্য। কেননা এখন পর্যন্ত মুজতাহিদ ও আলিমগণের মধ্যে যা কিছু ফয়েয-বরকতের চিহ্ন লক্ষ করা যায় তা একমাত্র মহানবী (সা)-এর অবদানে অর্জিত হয়ে তাঁদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই আলিমগণের অনুসরণ ছাড়া উপায় নেই। তাহলে মূলত এটা তাঁদের অনুসরণ নয় বরং আল্লাহ্ ও রাসূলেরই আনুগত্য। নিয়মটুকুই কেবল আলিমদের আমল-আখলাক, আচার-আচরণ থেকে শিখে নিতে হয়। অবশ্য একে যদিও 'সাবীলা মান আনাবা' তথা আনুগত্যশীলদের পন্থা বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে তা আল্লাহ্ ও রাসূলেরই পথ। উলামারা কেবল ব্যাখ্যা দেন, এ অর্থে তাঁরা মাধ্যম। শুধু এ সম্পর্কটুকুর দরুন তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করত 'সাবীলা মান আনাবা' অর্থাৎ আনুগত্যশীলদের পন্থারূপে অভিহিত করা হয়। —ওয়াজ—ইত্তিবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ২৪

৩৮. মহানবী (সা)-এর রওযা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব, তদুপরি যিয়ারত করা নবীর প্রতি ভালবাসার হক।

এ সম্পর্কে তিনি [মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)] বলেন ঃ (ক) একবার হাজী ইমদাদুল্লাহ (র)-এর সাথে জনৈক গোঁড়া গায়ের মুকাল্লিদের বাহাস হয়। উক্ত গায়ের মুকাল্লিদ মদীনা মুনাওয়ারা গমন করা থেকে লোকদের নিষেধ করত। তার দলীল ছিল ولا تشد الرحال الا ثلثة مساجد (কেবল তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা বৈধ নয়) হাদীসটি। হাজী সাহেব বললেন ঃ পিতা-মাতার যিয়ারত, ইলমে দীন শিক্ষা করা ইত্যাদি কারণেও কি সফর করা জায়েয হবে না ? এ কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলতে থাকে—জায়েয হলেও ফরয-ওয়াজিব নয় যে, যেতেই হবে। হাজী সাহেব বললেন ঃ হ্যাঁ শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয নয় ঠিকই, কিন্তু মহব্বতের কারণে তো জরুরী। স্মরণ করুন, সুলায়মান (আ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদ যদি কিবলা হতে পারে, ইবরাহীম (আ)-এর তৈরি মসজিদ যদি কিবলায় রূপান্তরিত হতে পারে

আর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্মিত মসজিদ কি এতটুকু যোগ্যতাও রাখে না যে, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মানুষ তথায় উপস্থিত হবে ? মহানবী (সা)-এর শান ও মান যেহেতু ছিল উবুদিয়্যাত তথা দাসত্বের এবং সুনাম-সুখ্যাতি তাঁর আদৌ পসন্দ ছিল না এ কারণে তাঁর মসজিদ কিবলায় পরিণত হয়নি। সে বলল ঃ মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে সফর তো জায়েয কিন্তু রওযার উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত নয়। হাজী সাহেব বললেন ঃ মসজিদে নববীর ফযীলত আসল কোত্থেকে ? সে তো হুযূর (সা)-এর কারণেই। তাহলে মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয আর যার কারণে মসজিদে নববীর ফযীলত সে মহান ব্যক্তির রওযা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা না-জায়েয এটাতো দারুণ বিস্ময়ের কথা। এর পর লোকটি নিরুত্তর হয়ে যায়। যদি কেউ বলে—যিয়ারত হুযূর (সা)-এর কোথায়, সেটা তো হয় কেবল কবরের। তাহলে তার জবাব হলো—একটি হাদীসে উভয়টিকে তিনি সমমানের উল্লেখ করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ من زارنى بعد مماتى فكانما زارنى فى حياتى (অর্থাৎ ইন্তিকালের পর যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করল সে যেন জীবিতকালেই আমার সাক্ষাত লাভ করল।) তারপর তাকে তিনি বললেন ঃ اهدنا الصراط المستقيم (আমাদের সরল-সোজা পথের হিদায়েত দান করুন) পাঠ করার সময় অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে পড় এবং হিদায়েতের জন্য দোয়া কর। লোকটি বলল ঃ এ ব্যাপারে আমার হিদায়েতের দোয়া করা নিষ্প্রয়োজন। হাজী সাহেব বললেন ঃ দোয়া করাতে ক্ষতির কি আছে, আমরাও তো দোয়া করি। সত্যের ওপর না থাকলে আমাদেরকে আল্লাহ হিদায়েত করুন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই মাগরিবের নামাযের সময় সে গায়রে মুকাল্লিদ হওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হয়। অতঃপর সে বলল ঃ আমি মদীনা শরীফ যাব, তখন সে মুক্তি লাভ করে এবং মদীনা শরীফ রওয়ানা হয়ে যায়। —মুজাদালাতে মাদিলাত, পৃষ্ঠা ২৪

(খ) রওযা পাকের যিয়ারতে ধন্য হওয়াটা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ভালবাসার অন্যতম হক। বিশেষত জীবিতকালে সাক্ষাত লাভে বঞ্চিতরা রওযা পাকের যিয়ারত দ্বারা কমপক্ষে বরকত লাভ করতে সক্ষম হয়। অবশ্য এটা যদিও হুবহু প্রথমটির সমমানের নয় কিন্তু তার প্রায় কাছাকাছি অবশ্যই। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من زارنى بعد مماتى فكانما زارنى فى حياتى

—(ইন্তিকালের পর আমার যিয়ারতকারী ব্যক্তি যেন জীবিতকালেই আমার যিয়ারত করল।) এর দ্বারা বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্তা স্বয়ং আকর্ষণযোগ্য বিষয়। কেবলমাত্র মুবাল্লিগ হওয়াটাই তাঁর সাথে সম্পর্কের ভিত্তি হলে রওযাপাকের যিয়ারত সুন্নত হবার কারণ ছিল না। কেননা এখন তো তাঁর তাবলীগের পর্যায় শেষ

হয়ে গেছে। পরিতাপের বিষয় হলো—কেউ কেউ এমনি হতভাগা যে, রওযাপাকের যিয়ারতের ফযীলত স্বীকার তো করেই না উপরন্তু এটাকে অবৈধ কাজ মনে করে। কানপুরে একবার চল্লিশ হাদীসের অনুবাদ বিষয়ে ছাত্রদের পরীক্ষা ছিল। রওযাপাক যিয়ারতের বৈধতা স্বীকার করে না এমন্ এক ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিল। জনৈক ছাত্রের পরীক্ষা শুরু হলে ঘটনাক্রমে সে এ হাদীস পাঠ করল ঃ من حج ولم يزرانى فقد جفانى (যে ব্যক্তি হজ্জ করল কিন্তু আমার যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি জুলুম করল।) সে ব্যক্তি আপত্তি করে বলে উঠল ঃ মহানবী (সা)-এর لم يزرنى (আমার যিয়ারত করল না) বাক্য তাঁর হায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ কথার দ্বারা ইন্তিকালের পর যিয়ারত প্রমাণ হয় না। ছাত্র অল্প বয়স্ক ছিল প্রশ্ন বুঝতে পারেনি। এর উত্তরও তার জানা ছিল না। সরল মনে সে অগ্রসর হতে থাকে। আল্লাহর মেহেরবানী—পরবর্তী হাদীসেই সে উত্তর পেয়ে যায়। من زارنى بعد مماتى فكانما زارنى فى حياتى (অর্থাৎ ইন্তিকালের পর যে আমার যিয়ারত করল সে যেন জীবিতকালেই আমার যিয়ারত করল।) উপস্থিত আলিমগণ বললেন—নিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার সমাধান হয়ে গেছে। এরপর সে নির্বাক হয়ে গেল। কেউ কেউ রওযাপাকের যিয়ারত সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে—বাস্তবে এখন তো কবরেরও যিয়ারত হয় না। কেননা পাথরের প্রাচীরবেষ্টিত হওয়ার দরুন রওযা শরীফ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। উপরন্তু দরজা পর্যন্ত রাখা হয়নি। এটা একটা সারবত্তাহীন প্রশ্ন। আমি বলব—যিয়ারতের জন্য রওযা শরীফের দৃষ্টিগোচর হওয়াটাই যদি অনিবার্য হয়, তাহলে মহানবী (সা)-এর যিয়ারতের জন্য তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাও অনিবার্য শর্ত হওয়া উচিত। অথচ কোন কোন সাহাবী অন্ধ ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) সাহাবী ছিলেন কিনা? অধিকন্তু মহিলাদের ব্যাপারে কি বলা হবে ? তাই সাহাবী হওয়ার জন্য যেরূপ হুকমী যিয়ারত তথা পরোক্ষ দর্শনকেই যথেষ্ট বলে স্বীকার করা হয়, অনুরূপ কবর শরীফ যিয়ারতের ক্ষেত্রেও পরোক্ষ যিয়ারতই যথেষ্ট বলে কেন স্বীকার করা হবে না ? অর্থাৎ এমন স্থানে উপস্থিত হওয়া কোন প্রকার আড়াল না থাকলে যেখানে দাঁড়িয়ে কবর শরীফ দেখে নেয়া সম্ভব হয়, এটাও কবর শরীফ যিয়ারতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিক (র)-এর উক্তি দ্বারা এ ব্যাপারে তৃতীয় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। তিনি বলেছেন ঃ يكره قول الرجل زرت قبر النبى صلى الله عليه و سلم অর্থাৎ ইমাম মালিক (র) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির একথা বলা মাকরূহ যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর শরীফ যিয়ারত করেছি। কাজেই প্রশ্ন হলো—কবর যিয়ারতের কথাটা মুখে উচ্চারণ করা পর্যন্ত যেক্ষেত্রে মাকরূহ সেক্ষেত্রে যিয়ারতের বাস্তব কর্মটা মাকরূহ কেন

হবে না ? জবাব হলো—প্রথমত, ইমাম মালিক (র)-এর এ উক্তি প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর এ মন্তব্য যদি প্রমাণিত হয়ও তবু এর অর্থ তা নয়, যা তোমরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। নতুবা তাঁর এত হেঁয়ালির কি প্রয়োজন ছিল। সরাসরি পরিষ্কার ভাষায়ই তিনি ব্যক্ত করতেন ঃ يكره زيارة قبر النبى صـ (মহানবী (সা)-এর কবর যিয়ারত করা মাকরূহ।) অভিব্যক্তির মাকরূহ দ্বারা যিয়ারত মাকরূহ হওয়ার রূপক অর্থের আশ্রয় নেয়ার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল ? বস্তুত এখানে তাঁর উক্তির অর্থ হবে—মহানবী (সা) রওযাপাকে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন হেতু যিয়ারতকারীর এ উক্তি সমীচীন নয় যে, আমি কবর শরীফের যিয়ারত করেছি। কেননা যেহেতু তিনি জীবিত [কাজেই মূলত যিয়ারত সে মহানবী (সা)-এরই সমাপন করেছে]।

মোটকথা, দুনিয়াতে এমন নিরস ব্যক্তিরও অস্তিত্ব রয়েছে যার অন্তরে মহানবী (সা)-এর রওযাপাকের যিয়ারতের আগ্রহ তো দূরের কথা বরং একে হারাম সাব্যস্ত করে অপর লোকদের পর্যন্ত বিরত রাখার প্রয়াস চালায়। কিন্তু যিয়ারতের ভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করুন কি পরিমাণ বরকত যে হাসিল হয়। যাহোক, একটা ঘটনার উল্লেখ দ্বারা আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। যদ্দ্বারা কবর শরীফ যিয়ারতের বরকত এবং মহানবী (সা)-এর তাতে জীবিত থাকা জ্ঞাত হওয়া যায়। সাইয়্যেদ আহমাদ রিফাঈ (র)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে, তিনি রওযাপাকে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ السلام عليك يا جدى (হে পিতামহ! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।) জবাব আসল— وعليك السلام يا ولدى (হে সন্তান! তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক।) পরক্ষণেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর কণ্ঠে কবিতা ছন্দ উচ্চারিত হতে থাকে ঃ

فى حالة البعد روحى كنت ارسلها

تقبل الارض عنى وهى نائبتى

فهذه دولة الا شباح قد حضرت

فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى

—দূরত্বে অবস্থানকালে আমার রূহকে আমি পাঠিয়ে দিতাম প্রতিনিধি হিসেবে আমার পক্ষ থেকে এ পুণ্যভূমি চুম্বনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখন আপনার আস্তানায় আমি নিজেই উপস্থিত, কাজেই আপনার দস্ত মুবারক প্রসারিত করুন তাতে চুমো খেয়ে আমার ওষ্ঠযুগল ধন্য হোক।

সাথে সাথে সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় দন্ত মুবারক রওযাপাক থেকে বের হয়ে আসে। মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে তিনি তাতে চুমো খান এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে একজন প্রশ্ন করে আপনার মনে কি তখন ঈর্ষা জেগেছিল ? তিনি বললেন ঃ শুধু কি আমি, ফেরেশতাকুল পর্যন্ত তখন ঈর্ষান্বিত হয়েছিল।

—শুকরুন নি'মাতে বিযিকরির রাহমাহ, পৃষ্ঠা ৪৪

৩৯. বিশ রাকাত তারাবীহও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

আজই আমি একটি চিঠির উত্তর লিখলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এরা হলো শিক্ষিত জিন। কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝানো সহজ। কিন্তু শিক্ষিত জিনরা বুঝে বড় কষ্টে। উক্ত চিঠিতে প্রশ্নকারী লিখেছিল—আজকাল মানুষের অলসতা প্রবল, তাই আট কিংবা বার রাকাতোক্ত হাদীসের ওপর আমল করাতে ক্ষতি কি ? আমিও চিন্তিত হয়ে পড়ি যে, এর জবাব কি লিখব! অতঃপর মহান আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ! এ মৌলভীর প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে বুঝিয়ে দেয়া হলো। উত্তরে লিখলাম– বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ হওয়ার ব্যাপারে 'ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর ইজমার বিরোধিতা জায়েয নয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠিত 'ইজমা'ই এ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীস 'মানসূখ' (রহিত) হওয়ার প্রমাণ। অবশ্য মাত্র আট রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ লেখা দ্বারা কোন কোন আলিমের ইজমার ওপর সৃষ্ট সন্দেহের জবাব এই যে, 'ইজমা' বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই 'ইজমা'র বিপরীত বিরল (شاذ) উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই তাকীদ যেহেতু প্রমাণ হয়েছে কাজেই তা বর্জন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পত্র লেখক আরো একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, "ফাত্হুল কাদীর" গ্রন্থের গ্রন্থকারের মতে তারাবী আট রাকাআত পড়া চাই। আমি লিখেছি—জামহুরের মোকাবিলায় কেবল ফতহুল কাদীর গ্রন্থকারের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের অভিমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষত যে ক্ষেত্রে স্বয়ং গ্রন্থকারের আমল নিজস্ব রায়ের বিপরীত হয়। কেননা এটা তাঁর গবেষণালব্ধ অভিমত। নতুবা বাস্তবে পড়েছেন তিনি সর্বদা বিশ রাকাআতই। কাজেই তাঁর গবেষণামূলক উক্তি আমলযোগ্য হতে পারে না। দিল্লীর নতুন মুজতাহিদদের নিকট আট রাকাআত তারাবীর কথা শুনে জনৈক ব্যক্তির মনে সংখ্যা সম্পর্কে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যে, তারাবীর নামায কত রাকাআত—আট না বিশ ? বিষয়টা জানবার উদ্দেশ্যে সে মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদের নিকট উপস্থিত হয়। এ সকল নতুন মুজতাহিদ নিজেদেরকে আবার হাদীসের ওপর আমলকারী বলে দাবি করে। তাদের

প্রতি প্রশ্ন জাগে—ভাই সাহেব! আট যেমন হাদীসের কথা বিশও তো হাদীসেরই নির্দিষ্ট সংখ্যা, তাহলে বিশের ওপর আমল করলে না কেন ? এর মাধ্যমে আটের ওপরও আমল হয়ে যেত।

মূলকথা হলো, নফসের আরাম আটের মাধ্যমেই নিহিত। তাই সে বিশ কেন পড়বে ? মন যা চায় তাই এরা করে, প্রয়োজনে তার জন্য দুর্বল হাদীসের আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করে না। এ ধরনের আলিমদের সম্পর্কে কারী আবদুর রহমান সাহেব (র) বলতেন ঃ এরা আমিল বিল হাদীস ঠিকই, (হাদীসের ওপর আমলকারী) কিন্তু আল হাদীসের (الحديث) আলীফ-লাম (لام - الـف) মুযাফ ইলাইহের স্থলাভিষিক্ত (عوض)। আর সে মুযাফ ইলাই হলো– নিজের নফস (نفس) বা প্রবৃত্তি। অর্থাৎ আমিল বিহাদীসিন্ নফ্স (عامل بحديث النفسى) অর্থাৎ আসলে তারা ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির গোলাম, হাদীসে রাসূলের ওপর আমলকারী নয়। তারা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুপাতে হাদীস তালাশ করে। যেমন এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এরূপ যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "কুরআনের কোন্ হুকুমটা তোমার অধিক পসন্দনীয় ?" সে উত্তর দিল— ربنا انزل علينا مائدة من السماء (অর্থাৎ হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাও।) তারাও তদ্রূপ তারাবী সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কেবল আট রাকআতবিশিষ্ট হাদীসটি বাছাই করে নিয়েছে। অথচ হাদীসে বার রাকাআতের উল্লেখও স্পষ্ট রয়েছে। একইভাবে তারা বিত্‌র সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কেবল এক রাকআত বিশিষ্ট হাদীসটিই গ্রহণ করে। অথচ হাদীসে বিতরের তিন রাকাআত, পাঁচ রাকাআত এমন কি সাত রাকাআতের উল্লেখও দেখা যায়।

যাইহোক, সে বেচারা তাদের ধোঁকায় পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মাওলানার নিকট জানতে চায়। জবাবে মাওলানা বললেন ঃ ভাই, শোন! মনে কর তহ্শীল অফিস থেকে তোমার নামে নোটিশ আসল—"খাজনা আদায় কর।" কিন্তু টাকার অংক তোমার জানা নেই। একজন নম্বরীকে তুমি জিজ্ঞেস করলে আমার খাজনা কত টাকা? সে বলল ঃ আঠার টাকা। অতঃপর তুমি দ্বিতীয় নম্বরীকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাতে সে বলল ঃ বিশ টাকা। তাহলে এখন বল, এমতাবস্থায় কত টাকা সাথে নিয়ে তোমার কাচারিতে যাওয়া উচিত ? সে বলল ঃ বিশ টাকা নিয়ে যাওয়াই সঙ্গত। যদি এত টাকাই হয়, তবে কারো কাছে হাত পাতা লাগবে না। আর যদি কম হয়, তবে টাকা অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু টাকা যদি কম নিয়ে যাই আর তার চেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়, তাহলে কার কাছে চাইতে যাব। মাওলানা বললেন ঃ তাহলে বোঝ, যদি সেখানে

দাবি হয় বিশ রাকআতের অথচ আছে তোমার আট রাকআত তাহলে কোত্থেকে এনে দেবে? পক্ষান্তরে যদি থাকে তোমার বিশ আর দাবি হয় কমের তাহলে বাকিটা বেঁচে যাবে, সময়ে কাজে আসবে। সে বলল—ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম। এখন থেকে সব সময় বিশ রাকআতই আমি পড়তে থাকব। তার মনে পূর্ণ শান্তি এসে যায়। সুবহানাল্লাহ! মানুষকে বোঝাবার কি অদ্ভুত পন্থা। প্রকৃতপক্ষে এরাই হলেন জাতির প্রজ্ঞাবান বিবেক। —রূহুল কিয়াস, পৃষ্ঠা ৭

(খ) এ মুহূর্তে এটা প্রমাণ করা আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আমলের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে বিশ রাকাআত তারাবী এবং তিন রাকাআত বিতর নামায জামাতের সাথে পড়া হতো। "মুআত্তা মালিক"-এ রেওয়ায়েত যদিও 'মুনকাতি' (ছিন্ন) বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে এটি 'মুতাওয়াতির' (বর্ণনা-পরম্পরা) পর্যায়ের। উম্মতের অব্যাহত আমল একে মুতাওয়াতিরের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ব্যস, আমলের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। লক্ষ করুন কেউ যদি দোকানে ঔষধ কিনতে যায় দোকানদারকে তখন এ প্রশ্ন করা হয় না—এ ঔষধ আসছে কোথা হতে? এবং এটা যে আমার কাঙ্ক্ষিত ঔষধ তারই বা প্রমাণ কি? এ ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে বরং দু-একজন জানা ব্যক্তিকে দেখিয়ে মনের সান্ত্বনা হাসিল করা হয়। কেউ যদি পশারীকে বলে যে, যার কাছ থেকে ক্রয় করেছ তার দস্তখত করা প্রমাণ দেখাতে পারলে তবে আমি বিশ্বাস করব যে, ঠিকই তুমি কাঙ্ক্ষিত ঔষধটিই ক্রয় করেছ। এমতাবস্থায় লোকেরা বলবে—আসলে তার ঔষধের প্রয়োজনই নেই। পশারীও পরিষ্কার বলে দেবে—দস্তখত দেখানোর আমার কোন দরকার নেই। বুঝে খাটে নাও, না হয় পথ দেখ। পূর্ববর্তী মুহাক্কিকগণের নীতিও অনুরূপ ছিল। তারা প্রশ্নকারীদের পিছনে মেধা ক্ষয় করতেন না। প্রশ্ন আসত আর তাঁরা মাসআলা বলে দিতেন। এর বিরুদ্ধে কেউ দলীল চাইলে তাঁদের পরিষ্কার জবাব হতো—যার ওপর তোমার বিশ্বাস হয় তার কাছ থেকে জেনে নাও, আমার বিতর্কের সময় নেই! ভূপালস্থ মাওলানা আবদুল কাইউম (র)-এর নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে কিতাব দেখে তিনি জবাব দিতেন আর বলতেন ঃ কিতাবে এরূপই লেখা রয়েছে। আর কেউ হাদীস জিজ্ঞেস করলে বলতেন ঃ ভাই আমি নও-মুসলিম নই, আমার বাপ-দাদা সবাই মুসলমান ছিলেন। এমনিতর তাদের বাপ-দাদারাও এবং মহানবী (সা)-এর যুগ পর্যন্ত সবাই মুসলমান ছিলেন। মহানবী (সা)-এর সমকালীন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ সামনে রেখে আমল করতেন। পরবর্তীগণ

তাদের পূর্ববর্তীগণের অনুকরণে আমল করতেন। এমনিভাবে আমল-পরম্পরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্মপদ্ধতি, নিয়ম-নীতি অনুসারে আমাদের পরিবারেও আমল চলে আসছে। কাজেই হাদীস তালাশ করার আমার প্রয়োজনই পড়েনি। বরং নও-মুসলিমদের জন্য এটা জরুরী। এ ধরনের জবাবের উদ্দেশ্য হলো—বিতর্ক পরিহার করা। কেননা অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক তাদের নিকট ছিল অপ্রিয়। আচ্ছা বেশ—জনসাধারণকে যদি বলে দেয়া হয় যে, হাদীসে এই আছে, তাহলে তারা মাসআলা উদ্ভাবনের নিয়ম কিভাবে জানবে। এতে পুনরায় তাদেরকে ফকীহ্গণের শরণাপন্ন হতে হবে। তাহলে প্রথম থেকেই ফকীহ্গণের ওপর তারা আস্থাশীল কেন হয় না।

মোটকথা, তারাবীর আমলের জন্য এটুকু প্রমাণই যথেষ্ট যে, মহানবী (সা) তারাবীর নামাযকে সুন্নত আখ্যা দিয়েছেন আর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সাহাবীগণ তারাবীর নামায বিশ রাকাআত আদায় করতেন। সাধারণ লোকদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট, এর চেয়ে অধিক তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা আলিমদের কাজ। এ মুহূর্তে সে আলোচনার অবকাশ অনুপস্থিত। তারাবীর অপর নাম 'কিয়ামে রমযান' (রমযান মাসের কিয়াম)। কেননা এটা রমযান মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর হাদীসে একে কিয়ামে রমযান আখ্যা দেয়াটা তারাবীর নামায তাহাজ্জুদ থেকে ভিন্নতর ইবাদত হওয়ার প্রমাণ। কেননা তাহাজ্জুদ রমযানের সাথে খাস নয়। এ-দুটার বিভিন্ন হওয়ার পক্ষে আরো বহু প্রমাণ রয়েছে।

—তাকলীলুল মানাম বিসুরাতিল কিয়াম, পৃষ্ঠা ১৭

৪০. প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) সকল ইমাম অপেক্ষা অগ্রগামী।

"ইমাম আবূ হানীফা (র) সর্বমোট ৭০টি হাদীস অবগত ছিলেন" এ উক্তিটি ইবনে খাল্লিকানের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়—তিনিই নাকি এটা লিখেছেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মুআত্তা ও আছারে মুহাম্মদ ইত্যাদি গ্রন্থে ইমাম সাহেবের সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ আলোচ্য সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি দেখা যায়। অবশ্য এটা সত্য যে, "মুসনাদাত আবূ হানীফা" নামে সেগুলোর পৃথক সংকলনের চেষ্টা না করে বরং অন্য মাশায়েখদের রেওয়ায়েতের অন্তরালে সেগুলোকে উল্লেখও করা হয়েছে। এর দ্বারাই অনুমান করা যায় তাঁর রেওয়ায়েতের পরিমাণ যে কত হবে। সত্তরের (৭০) বর্ণনার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। কিন্তু বন্ধুবর্গকে আমি বলি—তোমাদের ইবনে খাল্লিকানের উক্তির বিরোধিতা অর্থহীন, যেহেতু তদ্দারা আমাদের ইমাম সাহেবের ত্রুটির স্থলে শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ হয়। কারণ ইমাম সাহেবের

মুজতাহিদ হওয়া সর্বজনস্বীকৃত, কারো পক্ষে একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর অস্বীকার করবেই বা কিরূপে, যেক্ষেত্রে মাসআলার প্রতিটি অংগনে, প্রত্যেক স্তরে তাঁর অভিমত, তাঁর সমাধান বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু প্রতিপক্ষের লোকরা পর্যন্ত অধিকাংশ মাসআলায় তাঁর মতবিরোধের উল্লেখ করতে বাধ্য। এর দ্বারা বোঝা যায় বিপক্ষীয়রা ইমাম সাহেবকে মুহাদ্দিস স্বীকার না করুক কিন্তু মুজতাহিদ অবশ্যই স্বীকার করে থাকে। উপরন্তু ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্য ইমাম ইমাম আবূ হানীফার ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়া শুধু স্বীকারই করেননি, বরং ফিকহশাস্ত্রে অন্য সকল ইমামকে আবূ হানীফার عيال তথা শাগরিদ হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটাকে যদি যুক্তির প্রথম অংশ ধরা হয়, অতঃপর দ্বিতীয় অংশ যোগ করা হয় যে, ইমাম সাহেব সর্বমোট ৭০টি হাদীসই অবগত ছিলেন। এখন উভয় অংশ একত্র করে লক্ষ কর ফল কি দাঁড়ায়। সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অঙ্গনে এত তীক্ষ্ণ এবং উচ্চমানের অধিকারী ছিলেন যে, মাত্র সত্তরটি হাদীস অবলম্বনে এত অধিক পরিমাণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফেয হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ইমাম সে পরিমাণ মাসআলা উদ্ভাবনে সক্ষম হননি। শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞার এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ? বোঝা গেল তিনি ছিলেন শীর্ষতম মুজতাহিদ। কাজেই ইবনে খাল্লিকানের উক্তিতে আমাদের হানাফী বন্ধুদের হৈ চৈ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কেননা এর মাধ্যমে তিনি ইমাম সাহেবের ভূয়সী প্রশংসাই বরং ব্যক্ত করেছেন। কাজেই আমাদের তাদের বিরোধিতা করা নিষ্প্রয়োজন। কথাটাকে এই বলে মেনে নেয়া উচিত যে, বেশ—ইমাম সাহেবের নিকট সত্তরটি হাদীসই পৌছেছিল, কিন্তু তিনি এত বড় প্রজ্ঞাবান ছিলেন যে, এই গোটা কয়েক হাদীস অবলম্বনেই লাখো লাখো খুঁটিনাটি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

যাই হোক, এটা তো ছিল একটা সূক্ষ্মতর আলোচনা। নতুবা স্বয়ং মুহাদ্দিসগণই আলোচ্য উক্তির ভ্রান্তি স্বীকার করেছেন। এ কথা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রেওয়ায়েত ও বর্ণনা পর্যায়ে হানাফীগণ অন্যান্য ইমাম-মুহাদ্দিসের সমকক্ষ নন কিন্তু 'দেরায়েত' তথা অনুধাবন ক্ষেত্রে তাদের স্থান এত উচ্চে যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে বোঝা যাবে যে, কুরআন-হাদীস পড়েছে-পড়িয়েছে সকলেই কিন্তু মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে কেবল হানাফীরাই। একজন আহলে হাদীসের ঘটনা হলো—সে অধিকাংশ বিষয়ে মাসআলা আমার নিকট থেকে জেনে নিত। আমি তাকে বললাম—তোমাদের নিজেদের আলিমগণের কাছে এসব মাসআলা জিজ্ঞেস না করে আমাকে জিজ্ঞেস করার কি হেতু ? অথচ লোকটি স্বীয় মাযহাবের পাক্কা

আমলদার ছিল। কিন্তু ন্যায় কথা লুকানো যায় না। সে অনায়াসে বলে ফেলল—আমাদের আলিমগণ 'আমীন' আর "রফয়ে ইয়াদাইন" ছাড়া আর কিছুই জানে না, এসব মাসআলা তাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আপনার কাছ থেকে জেনে নিলেই মনে সান্ত্বনা পাই। মোটকথা, বোঝা গেল কোন কথা শোনা এক জিনিস আর মর্ম উপলব্ধি করা ভিন্ন জিনিস। —আল-জালাউ লিল-ইবতিদা, পৃষ্ঠা ২

সাধারণ লোকের সন্দেহের অবসান

৪১. নবী করীম (সা) তনয় হযরত ইবরাহীম-এর ইনতিকালে মহানবী (সা)-এর ক্রন্দন করা ধৈর্যহীনতার প্রমাণ।

বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, মহানবী (সা) নবীজাদা ইবরাহীম (রা)-এর ইন্তিকালে কেঁদেছিলেন। অথচ কোন কোন ওয়ালীআল্লাহ্‌র ঘটনা বর্ণিত আছে—বিপদকালে তিনি আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌ বলেছেন। অথচ নবীর মর্যাদা কারো পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়।

জবাব হলো—এরূপ পরিস্থিতিতে অশ্রুপাত করাই সন্তানের হক। আর আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সবর করা সৃষ্টিকর্তার হক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সন্তান ও আল্লাহ্‌ উভয়ের হক সমভাবে আদায় করেছেন। কিন্তু ওয়ালীআল্লাহর মর্তবা যেহেতু নিম্ন স্তরের, কাজেই তাঁর দ্বারা এক পক্ষের হক মাত্র আদায় হয়েছে, অপর হক অনাদায়ী রয়ে গেছে। একইভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—কিয়ামতের মাঠে কোন কোন নবীর মনে ওয়ালীআল্লাহর প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হবে। দৃশ্যত এখানেও প্রশ্ন ওঠে, আফযাল কর্তৃক মাফযূলের তথা উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নিম্নমানের প্রতি ঈর্ষার কি কারণ ? আসল কথা হলো—ঈর্ষা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। কোন সময় কামাল তথা পূর্ণতার অভাবে এরূপ হতে দেখা যায়, এখানে অবশ্য তা নয়। কখনো এক বিশেষ প্রশান্তি লাভের আশায়ও হতে পারে। যেমন উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তি দায়িত্বের চাপে মন্তব্য করেঃ পাঁচ টাকা বেতনের কর্মচারীরা আমার তুলনায় বেশ আরামে আছে, হিসেব-নিকেশের কোন বালাই নেই। নবীগণের ঈর্ষা মূলত এ জাতীয়। কেননা নবুয়তের উচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকার দরুন তাঁরা উম্মতের চিন্তায় অধীর থাকবেন। অথচ ওয়ালীআল্লাহগণ এ ধরনের চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত। অতএব এই হলো আলোচ্য মানসিক ঈর্ষার ক্ষেত্র ও রহস্য। —মুজদালাতে মাদিলাতে, পৃষ্ঠা ৩৬

৪২. পাত্র-পাত্রী প্রায় সমবয়সী হওয়া বাঞ্ছনীয়, ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়

অর্থের প্রলোভনে কেউ কেউ বৃদ্ধের নিকট মেয়ে বিয়ে দিয়ে জুলুম করে বসে। 'গাংগুহ্'তে এক মেয়ে আপন সখিদের বলত—আমার মিঞা বাড়ি এলে মনে হয়

নানাজী এসেছেন। ইমাম সাহেবের রূহের ওপর শত-সহস্র রহমত বর্ষিত হোক যে, তিনি বলেছেন ঃ সাবালিকা মেয়ের ওপর কারো ইখ্‌তিয়ার স্বীকৃত নয়। এ মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে বটে, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে ইমাম সাহেবের ফতোয়া পরিস্থিতির সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সঠিক ও অর্থবহ প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান পরিবেশে কন্যা কর্তৃক মাতা-পিতার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা লজ্জাহীনতারূপে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ মেয়ের অস্বীকৃতি নয় বরং এ জাতীয় প্রস্তাব করাটাই নির্লজ্জতার পরিচায়ক। মেয়ে বিয়ের নামই শুনতে রাজী নয় এতেই তার লাজ-লজ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত মেয়েদের দ্বারা এ-ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াই সমীচীন এবং বিবেকসম্মত কাজ। "বৃদ্ধলোকের তরুণী ভার্যা সাধারণত অকাল বৈধব্যের শিকার হয়" এ বিপর্যয়ের জবাবে কেউ কেউ বলে ঃ কার মরণ আগে হবে এটাতো জানা নেই। এ-ও হতে পারে যে, মেয়ের মৃত্যু আগে এসে গেল। কিন্তু বৃদ্ধের মরণ আগে আর মেয়ের মরণ পরে আসাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। লোকেরা সমবয়সের গুরুত্ব বড় একটা বিবেচনা করে না। বরং কোন কোন সম্প্রদায়ে বিপরীত রীতি লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ পাত্রী অপেক্ষা পাত্রের বয়স কম হয়। অথচ এর বাস্তব পরিণাম ভয়াবহ হতে দেখা যায়। একটু পরেই বিষয়টা আমি তুলে ধরছি, প্রমাণ দ্বারা যার করুণ পরিণতি সহজেই বুঝে আসবে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে পাত্রীর বয়স সামান্য কম হওয়াতে বিশেষ ক্ষতির কিছু নেই। এর কারণ হলো—বাস্তব জীবনে পুরুষের ভূমিকা শাসকের আর নারীকুল শাসিতের ভূমিকায় দিন কাটায়। দ্বিতীয়ত, নারীর শারীরিক গঠন-কাঠামো এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক বাঁধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল আকারে গড়া। কাজেই নারী দেহে দ্রুত বার্ধক্যের ছাপ পড়ে। প্রবাদ রয়েছে–"বিশেতে ছানা-মাখন, ষাটেতে গোরের ধন।" অতএব কম বয়সী নারী দেহে বার্ধক্য আগমনের কালে অধিক বয়সের দরুন পুরুষ দেহেও বার্ধক্যের পদধ্বনি শুরু হবে আর উভয়ে একই সাথে বার্ধক্যে পা-রাখবে। বিবেকসিদ্ধ এবং যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা) যে ক্ষেত্রে এটা পসন্দ করেননি সে ক্ষেত্রে পাত্রী অপেক্ষা পাত্রের বয়স কম হওয়াটা তাঁর পসন্দ কি করে হতে পারে, যা বিবেক বিরুদ্ধ। বিশেষত নারী শাসিত এবং পুরুষ অপেক্ষা দ্রুত বার্ধক্যে পৌছার বেলায় ? এমতাবস্থায় অধিক বয়স্ক বৃদ্ধা ও মাতৃতুল্য স্ত্রীর ওপর স্বামীর আধিপত্য বিস্তার কতটুকু মধুর হবে ? পরিণামে স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবে আর জীবন-সংসার অশান্তির অতলে তলিয়ে যাবে। কোন কোন গোত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের নিকট পূর্ণবয়স্ক যুবতী নারী বিয়ে দেয়া হয়, পরিণামে অশান্তি আর বিশৃংখলার অনলে সংসার জ্বলতে থাকে।

বন্ধুগণ! আমার নিকট এ ধরনের বহু প্রশ্ন আসে যে, স্বামী নাবালেগ, তাই বিবাহ বিচ্ছেদের কোন উপায় কি আছে ? আমার কথা—জুড়ে দেয়া তো পিতার অধিকারে কিন্তু তিনি ছিন্ন তো করতে পারেন না। কেননা অভিভাবক নাবালেগের লাভের অধিকারী মাত্র ক্ষতির নয়। কেউ প্রশ্ন করে নাবালেগ স্বামীর তালাক কার্যকর হবে কি-না। অথচ মাসআলা হলো—নাবালেগের তালাক কার্যকর নয়। সময়ে দেখা যায় ছেলে সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছে, কিন্তু স্ত্রী অধিক বয়সী। অথচ স্বামী তালাক দিতে রাজি নয়। কোন কোন সময় প্রশ্ন আসে—শ্বশুরের সাথে পুত্রবধুর সম্পর্ক গভীর ও মধুর, এখন উপায় ? জবাব দেই—উপায় আর কি—স্বামীর জন্য স্ত্রী হারাম। উক্ত মহিলা এখন এক দিকে তার মা, অপরদিকে স্ত্রী অথচ স্বামীর কোন পরোয়াই নেই। কাজেই শরীয়তের দৃষ্টিতে এ অবস্থা ও ব্যবস্থা কি করে পসন্দের হতে পারে ? অবশ্য দু-চার বছরের ব্যবধান হওয়াটা না-পসন্দের তেমন কিছু না। কানপুরে এক মেয়েকে বলপূর্বক দেবরের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় মেয়েরা খাওয়া-পরার ভয়ে শ্বশুরালয়ের লোকদের মতে সায় দিতে বাধ্য হয়। মোটকথা, এসব ঘটনা আলোচনা দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্ত্রীর বয়স অতিরিক্ত বেশি হওয়াটা হিকমত ও কল্যাণের পরিপন্থী। —ওয়ায —আবলুল জাহিলিয়াহ, পৃষ্ঠা ৫৭

৪৩. ইলমে দীন হাসিল করার সহজ পদ্ধতি।

আপনাদের করণীয় এতটুকুই যে, উর্দু[১] ভাষায় লিখিত ছোট ছোট দীনী কিতাব পাঠ করা। পড়ার সময় না থাকলে অথবা অধিক বয়সের দরুন পাঠ করা কষ্টকর হলে কারো কাছ থেকে শুনে নিন। বস্তুত এর জন্য প্রতি শহরে এমন দু-একজন বিজ্ঞ আলিম থাকা দরকার যাদের দ্বারা পড়া ও শোনার প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। এ-লক্ষ্যদ্বয় অর্জনের চারটি উপায় হতে পারে।

১. কেউ তাঁদের নিকট দীন শেখার উদ্দেশ্যে হাজির হলে তারা শিক্ষা দেবেন। ২. মাসআলা জানতে চাইলে তা নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন। ৩. প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত একটি দিনে লোকদের জমা করে মাসআলার কিতাব তাদের সামনে তিনি পাঠ করবেন আর লোকরা মনোযোগসহ তা শুনবে। মাসআলার মধ্যে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, লেন-দেন, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদির হুকুম শামিল থাকবে। ৪. চতুর্থ কাজ হবে সপ্তাহ কিংবা পনর দিন অন্তর অন্তর তিনি ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করবেন এবং লোকদের ভয় ও আশার বাণী শোনাবেন। ওয়ায মাহফিলকে

১. বাংলাভাষীদের জন্য বাংলায় লিখিত ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করা বিধেয়। —অনুবাদক

মাসআলা বর্ণনার জমায়েত থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে দেখা গেছে, ওয়ায মাহফিলে ফিকাহর মাসআলা বড় একটা ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। একে তো খুঁটিনাটি মাসআলা প্রায়ই স্মরণ থাকে না, দ্বিতীয়ত মানুষ সাধারণত চমকদার বিষয়বস্তু শোনার আগ্রহ নিয়েই ওয়ায মাহ্‌ফিলে জমায়েত হয়। এজন্য ওয়াযের মধ্যে ভীতি ও আশাপ্রদ এবং উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় আলোচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ চার ধরনের কাজ ন্যস্ত থাকবে আলিমের দায়িত্বে। আর শহরবাসীদের দায়িত্বে থাকবে আলিমের আর্থিক সংস্থান করে দেয়া। এটা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। দেখুন, যে জনপদে চিকিৎসকের অভাব সেখানকার বাসিন্দাগণ চাঁদা তুলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা করে এবং তার বেতন যোগায়। রূহানী রোগের চিকিৎসা কি তবে শারীরিক ব্যাধির সমান গুরুত্বপূর্ণও নয় যে, এর জন্য প্রয়োজনে দু'পয়সা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতে হবে। এ হলো পুরুষদের কর্মসূচী। কিন্তু মহিলাদের সহজ কর্মপদ্ধতি হলো—শিক্ষিতা মেয়েরা ঘরে বসে বেহেশতী জেওর অথবা এ জাতীয় কোন কিতাব পাঠ করবে। আর অশিক্ষিতা মহিলারা নিজ ছেলেমেয়েদের দ্বারা বেহেশ্‌তী জেওরের মাসআলাসমূহ পাঠ করিয়ে শুনে নিবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে এ কাজের জন্য তৈরি করবে এবং তাদের মাধ্যমে এ জাতীয় শিক্ষাধারা চালু রাখবে। এ হলো সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী। এর দ্বারা ইনশাআল্লাহ্ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই দীনী ইল্‌ম হাসিল করতে সক্ষম হবে। অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং দীনী পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে। —ওয়ায—আছারুল মুহাব্বত, পৃষ্ঠা ২০

৪৪. কুরআন শরীফ একটি ভাষ্য, হাদীস-ফিকাহ তার ব্যাখ্যা।

কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র ভাষ্য, হাদীস-ফিকাহ্ ইত্যাদি এর ব্যাখ্যাস্বরূপ। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ একেই القياس مظهر لا مثبت বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ হাদীস ও ফিকাহ কুরআনের সারমর্মকে সুস্পষ্ট আকারে, সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করে মাত্র, কুরআনের বিপরীত কোন হুকুম বর্ণনা করে না। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো স্পষ্ট করা যায়। যেমন একটি সিন্দুক তালাবদ্ধ আছে। চাবি দ্বারা খুলে দিলে ভিতরের মণিমুক্তা দেখা যায়। তাহলে এগুলো চাবির সৃষ্ট নয় বরং পূর্বেই এসব মওজুদ ছিল, চাবি এগুলো দৃশ্যমান হওয়ার মাধ্যম মাত্র। সুতরাং হাদীস-ফিকাহ্ কুরআনের জন্য চাবিস্বরূপ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা মূলত এ থেকেই উৎসারিত। কবির ভাষায় ঃ

عباراتنا شتى وحسنك واحد

و كل الى ذالك الجمال يشير

—আমাদের মন্তব্যের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু একক ও অভিন্ন রূপের ছটায় তুমি মহিমান্বিত, গোটা সৃষ্টিকুল তোমার সে রূপের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

প্রেমিকা সকাল-বিকাল যতই রূপচর্চায় মগ্ন থাকুক আর পোশাকের পরিবর্তন ঘটাক না কেন অন্যরা তার পরিচয় লাভে ভুল করতে পারে, কিন্তু প্রেমিক নয়নের ভ্রম হতে পারে না। তার কণ্ঠে ছন্দায়িত সুর লহরী মূর্ত হয়ে ওঠে ঃ

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش

من هر انداز قدرت می شناسم

(অর্থাৎ যে রঙ্গের পোশাকই তুমি পরিধান করো চলার ভঙ্গিতেই আমি তোমায় চিনে ফেলি।) অতএব প্রেমিক নয়নে আর আশেক দিলে হাদীস-ফিকাহ্ সব কিছুতে কুরআনের ছবিই ভেসে ওঠে। মাওলানা মাযহার নানুতুবী (র) মাওলানা গাংগুহীকে লক্ষ করে বলতেন, আপনার সান্নিধ্যে আসলে তো হাদীস সব হানাফী রং-এ রঞ্জিত মনে হয়। তাঁদের নযরে হাদীসের মধ্যে ফিকাহ্ ভেসে উঠত। উপরন্তু ওলী-আল্লাহ্‌গণের অবস্থা হলো ঃ

بسکه در جاں فگار و چشم بیدارم توئی

هرچه پیدا می شود از دور پندارم توئی

—দেহ-মনে একমাত্র তুমিই বিরাজমান, দূর থেকে দৃষ্টির আওতায় যা কিছু ভেসে আসে তা কেবল তুমিই তুমি।

তদ্রূপ ওলী-আল্লাহগণ সবকিছুতেই আল্লাহ্‌কে দেখতে পান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের দৃষ্টিতে এসবই আল্লাহর আসনে আসীন। আস্তাগফিরুল্লাহ! আল্লাহ মাফ করুন, বান্দা বান্দাই আর আল্লাহ্ আল্লাহ্‌ই। যেমন কুরআন কুরআনই আর হাদীস হাদীসই। মাওলানা জামীর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার আত্মহারা অবস্থায় তিনি বলতে থাকেন ঃ দূর থেকে যা কিছু দেখি কেবল তুমিই তুমি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আল্লাহ)। বিদ্রূপের সুরে একজন বলল ঃ মাওলানার যদি গাধা নযরে আসে তাহলে ? জবাব দিলেন ঃ বুঝব তুমিই। —ওয়ায—হাক্কুল ইতাআত, পৃষ্ঠা ১২

৪৫. আজকাল মুস্তাহাবের পরোয়া করা হয় না, এর শিক্ষার প্রতিও যত্ন নেয়া হয় না

আজকাল মুস্তাহাবকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয় না। অবশ্য আমলের বেলায় এটা ফরয-ওয়াজিবের ন্যায় আবশ্যকীয় অবশ্যই নয়। কিন্তু দুই কারণে এর শিক্ষা জরুরী। প্রথমত, মানুষ যেন এর অবস্থান এবং মুস্তাহাব হওয়াটা জানতে পারে। তাহলে কেউ একে না-জায়েয অথবা ফরয-ওয়াজিব জ্ঞান করবে না। বিশ্বাসগত পরিশুদ্ধির জন্য এটা দরকার। এ হিসেবে মুবাহ্ বিষয়ের শিক্ষাও প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত মুস্তাহাবের সুফল ও বরকত অগণিত। সে সবের অজ্ঞতাই এর প্রতি অনীহার কারণ। ন্যূনতম মুস্তাহাবের সুফল জানার পর আক্ষেপের সুরে নিজেই আপনারা বলবেন—এ মূল্যবান মণি-মুক্তার খবর না জেনে প্রকৃতই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলাম। আমলে পূর্ণতা লাভের জন্য এটা প্রয়োজন। মোটকথা—কুরআনপাকে মুস্তাহাবের উল্লেখ বে-দরকারী নয় ; বরং শিক্ষার পর্যায়ে এর বর্ণনাও গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। আন্তরিক ভালবাসা দ্বারাই কেবল এর মূল্যমান বুঝে আসা সম্ভব। প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি লাভের ক্ষুদ্রতম উপলক্ষ সন্ধানের প্রতি প্রেমিকের আকর্ষণ চিরন্তন। প্রেমিক যখন জানতে পারে অমুক বিষয়ে আমার প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি তখন সে সেসব পুরো করার প্রাণপণ চেষ্টা চালায়, এমন কি প্রয়োজনীয় কোন কাজ যেন তার দ্বারা উপেক্ষিত না হয়, এতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। অন্তরে এ ধরনের প্রেমের আকর্ষণ সৃষ্টি সাপেক্ষেই কেবল আমাদের দ্বারা মুস্তাহাবের মূল্যায়ন আশা করা যেতে পারে। এর বর্ণনাকে আমরা আল্লাহ্র রহমত ও রাসূল (সা)-এর অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য করতে পারি যে, আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর সন্তুষ্টির পথ সহজ-সরল ভাষায় কত সুন্দর-সাবলীল ভঙ্গিমায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুস্তাহাব বিষয়ের বর্ণনা বাদ দিয়ে শরীয়তের কেবল আবশ্যকীয় বিষয়াদির উল্লেখ করা হলে আল্লাহ্র প্রেমে নিবেদিত প্রেমিকরা ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। কেননা শুধুমাত্র জরুরী বিষয়কে যথেষ্ট মনে করা প্রেমাঙ্গনের রীতিবিরোধী। একে সে অর্পিত দায়িত্ব জ্ঞান করে এর বাইরে অতিরিক্ত এমন কিছু সম্পাদনে উদগ্রীব থাকে যা তার নিজের প্রতি মাহবুবের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হয়। লক্ষ করুন, কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য আপনার বেতনভুক্ত কর্মচারী দায়িত্বটুকু সম্পাদনেই সীমিত তৎপরতা দেখাবে। অতিরিক্ত কাজের প্রতি তার আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। আপনার অপর একজন চাকর বাল্যকাল থেকে আপনি লালন-পালন করছেন, যে আপনার স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ কেবল নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা আদৌ সে যথেষ্ট মনে করতে পারে না। বরং তার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা হবে মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এমন যেকোন কাজ আমার

হাতে সম্পাদিত হোক। নির্দিষ্ট দায়িত্ব কাজটুকু ছাড়াও রাতে সে আপনার পা টিপে দেবে, পাখা ঘুরাবে, আপনার জাগার আগেই সে প্রয়োজনীয় সব কাজ সমাধা করে রাখবে। অথচ তার কল্পনাই হবে না যে, এসব আমার দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ, এর পিছনে আমার শ্রম ব্যয় করার স্বার্থকতা কোথায় ? আদৌ না বরং মালিকের প্রতি তার ভালবাসা ও আত্মনিবেদন তাকে বাধ্য করবে মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এমন কাজ করতে।

বন্ধুগণ! ভুল ধারণাবশে আল্লাহ্র সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল আইনের বাঁধনে আঁটা। সে জন্যেই ফরয-ওয়াজিবের অতিরিক্ত মুস্তাহাবকে আমরা গুরুত্বহীন ধারণা করি। মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আমাদের সম্পর্ক প্রেম ও আত্মনিবেদনের আবেশে গড়া হলে ফরয-ওয়াজিবকে যথেষ্ট জ্ঞান না করে মুস্তাহাবের সন্ধানে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত ছিল। যে কাজ আল্লাহ্র প্রিয়, যে কর্মে তিনি সন্তুষ্ট তা জানার পর সে পথে অগ্রগামী থাকার লক্ষ্যে আমাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা-যত্ন থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। উল্লেখ্য, কোন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আশেক বা প্রেমিকজনের পক্ষে এতটুকু জ্ঞাত হওয়াই যথেষ্ট যে, এ কাজ আমার মাহবুবের প্রিয় নয়। এ ক্ষেত্রে না-পসন্দের মাত্রা কতটুকু, এর জন্য কি সাজা-শাস্তি নির্ধারিত, তিনি মনক্ষুণ্ন হবেন না-কি শুধু মুখ ফিরিয়ে নিবেন এসব প্রশ্ন সে কল্পনাই করে না। এ সব কথা তার নিকট অর্থহীন। আর যে কাজ তাঁর অসন্তুষ্টি ছাড়াও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তার দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া অকল্পনীয়। কিন্তু আজকাল আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে—যখন কোন কাজের পরিণাম গুনাহ বলে জানা যায়, তখন প্রশ্ন ওঠে—গুনাহ কোন্ জাতের, বড় না ছোট ? তার অর্থ এই যে, ছোট হলে বোধ হয় করা যায়। এটা আল্লাহ্র সাথে ক্ষীণ সম্পর্কেরই পরিচায়ক। অবশ্য একেবারে ছিন্ন বুঝায় না, যেহেতু এ জাতীয় প্রশ্ন জাগাটাই তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেয়। এদের পক্ষ টেনে আমি বলব—তাদেরকে আল্লাহ্র সাথে একেবারে সম্পর্কহীন যেন মনে করা না হয়। কারণ সম্পর্ক এতটুকু তো বিদ্যমান যে, আল্লাহ্কে তারা অধিক নারাজ করতে চায় না, নতুবা গুনাহ বড়-ছোট এ প্রশ্নের তাদের দরকারই ছিল না। তাতে বোঝা গেল, গুনাহ বড় হলে তারা শংকিত যে, আল্লাহ্ তাতে ভীষণ নারাজ। কিন্তু সম্পর্ক যেহেতু গভীর নয়, তাই সামান্য নারাজ করতে তারা একটু সাহসও পায়। মোটকথা, ব্যক্তির এ প্রশ্ন আল্লাহ্র সাথে তার সম্পর্কের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

আমার এ বক্তব্য শুনে "গুনাহ ছোট কি বড়" এ প্রশ্নকর্তারা হয়তো খুশি হবে এই মনে করে যে, যাক—আল্লাহ্র সাথে আমাদেরও সম্পর্ক প্রমাণ হয়ে গেল এক হিসেবে কথাটা খুশি হবার মতই। যেমন কবির ভাষায় ঃ

بلا بود ے اگر اینهم نبودے

অর্থাৎ যদি এ-ও না হতো, তবে বিপদই ছিল। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল নামমাত্র সম্পর্কের ওপর সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি শুধু এ টুকুকেই যথেষ্ট মনে করা হয় ? আদৌ না। বরং প্রত্যেক সম্পর্কের শেষ বিন্দুই সবার কাম্য। দেখুন, স্ত্রীর সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, যা দুই কথায় গড়ে এক কথায় ভাঙে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কাউকে আমরা কেবল নামসর্বস্ব সম্পর্ক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেখি না। বরং সবাই কামনা করে স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক সুগভীর ও প্রীতির শক্ত ডোরে মজবুতভাবে বাঁধা হোক। এজন্যই শুধু বিধিবদ্ধ ও নির্দিষ্ট জরুরী হক আদায় করাকেই যথেষ্ট ভাবা হয় না। বরং স্ত্রীর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে প্রাপ্য হকের অতিরিক্ত কাজ এবং গহনা-অলংকার তৈরি করে দেয়। দাম্পত্য বন্ধন সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই কেবল এসব করা হয়। অথচ এতে স্ত্রীর কোন দাবি নেই। স্বামী-স্ত্রী যদি শুধুমাত্র আইনগত সম্পর্কটুকুই রক্ষা করে চলে আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না করে, তবে ন্যূনতম সম্পর্কই বাকি থাকতে পারে মাত্র, কিন্তু তাতে স্বাদের আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় সারাক্ষণ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার প্রবল আশংকা বিদ্যমান থাকে। সুদৃঢ় করার সযত্ন প্রয়াসের মাধ্যমেই কেবল সম্পর্ক স্থিতিশীল হতে পারে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণই শুধু স্বামীর দায়িত্ব, তার সাজ-অলংকার, মূল্যবান রেশমী পোশাক, ঔষধ-পথ্য কিংবা তার আত্মীয়ের সেবা-যত্ন স্বামীর ওপর অনিবার্য নয় কিন্তু স্ত্রীর মন জয় এবং সম্পর্ক মধুর করার উদ্দেশ্যেই এত সবের আয়োজন। অথচ ইতিপূর্বের আলোচনা দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, এ সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তা ছিন্ন করার পক্ষপাতী নয়। আর কোনক্রমে বিচ্ছেদ এসে গেলে কি পরিমাণ বেদনা অনুভূত হয় ? তাই তা রোধ করার জন্যই দৃঢ়তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা হয়। তাহলে আশ্চর্যের কথা যে, একটা দুর্বল সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল আনুষঙ্গিকতা বর্জিত মূল সম্পর্কের ওপর ভরসা না করে বিচ্ছেদের আশংকায় একে মজবুত করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। আর মহান আল্লাহর বেলায় কেবল নামমাত্র সম্পর্ককেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অথচ আল্লাহ্‌র সাথে অতুলনীয় গভীর সম্পর্কডোরে আমরা অষ্ট প্রহর বাঁধা। তাহলে একে সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের যত্নশীল না হওয়ার কি কারণ। সম্পর্ক কেটে যাওয়ার আশংকা যেখানে সর্বদা অথচ এটা কারো কাম্যও নয়, তাহলে একে দৃঢ় করার ভাবনা কেন অনুপস্থিত ? তাই মাওলানা রূমী বলেন ঃ

ایکه صبرت نیست از فرزند وزن

صبر چوں داری زرب ذو المنن

ایکه صبرٹ نیست از دنیائے دوں

صبر چوں داری زنعم الما هدون

—হে মানুষ! স্ত্রী-সন্তানের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াটা যেখানে সহ্যের বাইরে সেক্ষেত্রে করুণাময় 'রবের' সম্পর্ক ছিঁড়ে যাক, এটা তোমার কিরূপে সহ্য হবে। হে মানুষ! নিকৃষ্ট দুনিয়ার সম্পর্ক নষ্ট হওয়া যার ধৈর্যে কুলায় না, পরম অনুগ্রহকর্তা আল্লাহর সম্পর্ক বিলীন হোক এতে তোমার সবর থাকবে কিরূপে ?

পরিতাপের বিষয়, ক্ষুদ্র জিনিসের সম্পর্ক আমাদের আচরণে নষ্ট হতে দেই না অথচ একই দুর্বলতা আল্লাহর সম্পর্কে দেখা দিলে আমাদের অন্তরে ব্যথা লাগে না। অবশ্য আল্লাহ্‌র সাথে আনুষঙ্গিকতা বর্জিত নামসর্বস্ব সম্পর্ক যদিও একটা নিয়ামত কিন্তু এহেন দুর্বল সম্পর্ক যথেষ্ট ধারণা করাটা নিতান্ত জুলুম। কাফেররা তো সম্পর্কের গোড়া ছিন্ন হওয়াতেই সন্তুষ্ট। এ মুহূর্তে তাদের সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আক্ষেপ তো হয় আমাদের আজকালের মুসলমানদের জন্য যে, আল্লাহ্‌র সাথে এহেন দুর্বল সম্পর্ক আমরা কিরূপে সয়ে যাই। যে কারণে আমরা মুস্তাহাবের মূল্যও দেই না, গুরুত্বও বুঝি না। আমার নিজের কথাই বলি—বালক বয়সে আমি অধিক পরিমাণ নফল পড়ায় অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু "মুনিয়াতুল মুসল্লী" পড়ে যখন জানতে পারলাম যে, মুস্তাহাব আমল না করাতে গুনাহ নেই তখন থেকেই নফল পড়া ছেড়ে দেই। তখন তো সতর্ক হইনি যে, করছি কি, কিন্তু এখন উপলব্ধি জাগে যে, কাজটা ভাল করিনি। তাহলে এর সারকথা এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্‌র সাথে আমরা কেবল নিয়মের সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী আর শুধু অত্যাবশ্যক টুকুই মেনে চলি। তাহলে শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিদের সাথেও কি আমরা নিতান্ত প্রয়োজনীয় খেদমতের সম্পর্কটুকুই রক্ষা করি আর দায়িত্বের বাইরে কিছুই করি না ? মোটেই না। দেখুন, কোন কোন সময় নিজ স্বার্থে অথবা শ্রদ্ধা-ভক্তির আবেগে মুরুব্বিদের সাথে আমরা নিছক দায়িত্বের অতিরিক্ত খেদমতও করি। তাহলে আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র হক কি পীর-বুযুর্গ ও মান্যজনদের সমতুল্যও নয় ? কিছুটা তো ইনসাফ থাকা উচিত। তাহলে এটা কেমন কথা হলো যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কেবল ফরয-ওয়াজিবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব আর ওয়াজিব বহির্ভূত কাজের গুরুত্বই থাকবে না।

অবশ্য এটা সত্য যে, আল্লাহ্‌র শান ও মান অনুপাতে আনুগত্য আমাদের সাধ্যের অতীত, আমরা যত চেষ্টাই করি তাঁর হকের তুলনায় তা অল্পই হবে। মুস্তাহাব বিষয়ে আমাদের শৈথিল্যের এ-ও একটা কারণ। কেননা আমরা ধোঁকায় পড়ে যাই যে, আল্লাহ্‌র হক আদায় করা যখন সম্ভবই নয় তাহলে আর অধিক চেষ্টা করে লাভ কি। কিন্তু এ ধারণা মারাত্মক ভুল। সন্দেহ নেই আল্লাহ্‌র হক অনুপাতে আমল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু নিজেদের সামর্থ্য অনুপাতে তো করা যায়। রাজা-বাদশার দরবারে দিন-রাত উপহার সামগ্রী আসতেই থাকে আর সবাই জানেও যে, আমাদের উপহার তাদের মর্যাদাতুল্য নয়। কিন্তু তবুও উপহার দেয়া কখনো বন্ধ থাকে না বরং সাধ্যমত উত্তম উপহার পাঠানো অব্যাহত থাকেই। তাই প্রবাদ রয়েছে ঃ উপহার হয়তো পরের মান অনুপাতে হবে অথবা কমপক্ষে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী। সুতরাং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের আমল করা উচিত। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাদের নিজেদের সাধ্যমত আমল করাই যথেষ্ট। শক্তির বাইরে আপনার করার প্রয়োজন নেই। বান্দা নিজের শক্তি অনুসারে আমল করুক এটাই আল্লাহ্‌র হুকুম, আল্লাহ্‌র মান অনুপাতে নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র হক আদায় করা সম্ভব নয়—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দেয়াটা নিতান্ত ভুল। অবশ্য সময়ে বিশেষ পরিস্থিতি এবং শরীয়তসম্মত কারণে মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দেয়া ভিন্ন কথা। যেমন মানুষকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, কাজটা ওয়াজিব নয় অথবা সফরকালে সাথীদের অবস্থা লক্ষ করে নফল থেকে বিরত থাকা কিংবা ক্লান্তির পর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে মুস্তাহাব ছেড়ে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নয়। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ ان لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا (অর্থাৎ তোমার ওপর তোমার নিজের ও চোখের হক রয়েছে) কিন্তু বিনা কারণে নিছক অলসতাবশত ছেড়ে দেয়া থেকে হাদীসে পানাহ চাওয়া হয়েছে। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ اللهم انى اعوذبك من العجز والكسل (হে আল্লাহ্! আমি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।) উত্তমরূপে বুঝে নিন—বিশ্রাম এক জিনিস, আর অলসতা ভিন্ন জিনিস, উভয়কে অভিন্ন মনে করা ভুল। মহানবী (সা) নিজে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন এবং কোন সাহাবীকে মুস্তাহাব তরক আর নফলের মাত্রা কমাতে উৎসাহ দিয়েছেন। তাহলে বুঝুন, বিশ্রাম ও অলসতার ব্যবধান কতটুকু। ব্যক্তি তার সাধ্যমত পরিশ্রমের পর তাকে হুকুম করা হয়—শক্তির বাইরে কাজের দরকার নেই, গিয়ে আরাম কর। এর নাম বিশ্রাম। আর অলসতা বলা হয় সাধ্যমত কাজ না করা কিংবা শক্তি থাকা সত্ত্বেও কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখা। এ থেকেই

আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের গভীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মুস্তাহাবও জরুরী বিষয়। "আল্লাহ্‌র প্রত্যেক কাজের প্রতিটি অংশ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ"—আমার এ মন্তব্য থেকে সৃষ্ট সন্দেহের জবাবে আমি এতক্ষণ আলোচনার জের টানছিলাম। কেননা কুরআনে বর্ণিত মুস্তাহাব বিষয়গুলোকে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করা হয়। তাই আমি প্রমাণসিদ্ধ আলোচনা করেছি যে, এ শিক্ষাও অপরিহার্য। কারণ এগুলোর অসংখ্য সুফল ও বরকত রয়েছে। সুতরাং এর ফলে অনেক সময় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। এ হলো এক দিকের বরকত। কারণ তাহাজ্জুদ, ইশরাকে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে পাপাচার হতে আত্মরক্ষা করা অধিকতর সহজ। কিন্তু যে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের ফরযটুকু আদায় করে তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতার অতিরিক্ত এর আরো একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাহলো মুস্তাহাব আমলে অভ্যস্ত ব্যক্তি দীনদার-পরহেযগার হিসেবে সমাজে খ্যাতি লাভ করে। তাই এ উপাধির ফলে অন্যায়-পাপ কাজে লিপ্ত হতে নিজে নিজেই সে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করে। আবার সময়ে কোন কোন মুস্তাহাব আমল আল্লাহ্‌র এমনি পসন্দ হয় যে, এটাই তার মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

—যম্মুন্ নিসইয়ান, পৃষ্ঠা ৩

৪৬. কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সাধারণ লোকের পক্ষে ক্ষতিকর।

জনৈক মোল্লাজী আমার নিকট কুরআনের অনুবাদ (যাকে সাধারণ লোকেরা বলে মুতারাজ্জিম, যেমন আমার জনৈক বন্ধু "দিওয়ানে-মুতানাব্বী"-কে বলত মুতাবান্নী) নিয়ে হাজির হয়। শাহ আবদুল কাদেরকৃত উক্ত অনুবাদ সাধারণ কথ্য ও প্রচলিত পরিভাষায় করা হয়েছিল। তাতে—

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ -

—ওযূ সম্পর্কিত আয়াতের তরজমা করা হয়েছিল ঃ "ধোও তোমরা নিজেদের মুখগুলিকে এবং হাতগুলিকে আর মল মস্তকসমূহকে এবং পাগুলিকে। এতে "নিজেদের পাগুলিকে" প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী "ধোও মুখগুলি এবং হাতগুলির" সাথে সম্পৃক্ত হবে, পরবর্তী "মল মাথাগুলিকে" শব্দের সাথে নয়। এ থেকে মোল্লাজী ধারণা করে নিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী শব্দের সাথে এর সম্পর্ক। এখন অনুবাদ দেখিয়ে তিনি আমাকে বলতে লাগলেন—কুরআন দ্বারা তো পা-মসেহ্ করা প্রমাণ হয়। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম যে, যে লোক 'আতফ' ও 'ই'রাব' (শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ও

মাত্রা) সম্পর্কে অবহিত নয়, এমন জাহেলকে কি করে বোঝাব। যা হোক আমি বললাম, মোল্লাজী! আপনি কি করে এটা বুঝলেন যে, কুরআনপাক আল্লাহ্‌র কালাম ? তিনি বলেন ঃ আলিমদের কথায়। আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবর, আরবী বাক্য সমষ্টিকে 'কুরআন' বলার ব্যাপারে তো আলিমরা সত্যবাদী, ঈমানদার, কিন্তু পা-ধোয়া ফরয বলার ব্যাপারে কি তারা ঈমানদার নন! কাজেই আলিমগণ বলেছেন যে, পা-ধোয়া ফরয আর মসেহ করা জায়েয নয়। অধিকন্তু তারা এ-ও বলেছেন যে, তোমার মত লোকদের কুরআনের তরজমা পড়া জায়েয নয়। খবরদার ভবিষ্যতে কখনো তরজমা পড়বে না। শুধু তিলাওয়াত করবে, অনুবাদ মোটেই দেখবে না। অন্য এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল, যে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও অযিফা পাঠে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু কুরআনের অনুবাদ পড়ে গোমরাহ হয়ে যায়। সে আমাকে বলল, কুরআন তিলাওয়াতের সময় আমি راعنا শব্দটি ছেড়ে দেই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا যার তরজমা করা হয়েছে ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা راعنا বলো না। তাহলে তিলাওয়াত কালে راعنا শব্দকি পড়ব না ? বললাম راعنا তো ছাড়বে না কিন্তু কুরআনের অনুবাদ পড়া ছেড়ে দাও। কেননা বোঝার যোগ্যতা তোমার নেই।

বন্ধুগণ! কুরআন-হাদীসের তরজমা দেখে এভাবে মুজতাহিদরূপ নিয়ে লোকেরা শরীয়তের সর্বনাশ সাধন করেছে। এখন এদের অযোগ্যতার দৃষ্টিতে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া না হলে এবং কুরআনের অনুবাদ পড়া থেকে নিষেধ করা হলে কেউ কেউ বলে বেড়ায়—আলিমরা আমাদের প্রশ্নের সমাধান দিতে অক্ষম। আমি বলি—দুঃখ তো এই যে, আপনারা বুঝতে পারছেন না, জবাব তো প্রশ্ন মাত্রেরই রয়েছে, কিন্তু তা বুঝবে কে ? কবি বলেছেন ঃ

سيوف حداد يالوى بن غالب
مواض ولكن اين السيف ضاء ب

—সুদক্ষ কর্মকার কর্তৃক ইস্পাত নির্মিত তরবারি প্রস্তুত আছে বটে, কিন্তু হে লুয়াই ইবনে গালেব! সে অসির আঘাত পড়ছে কোথায় ?

বন্ধুগণ! আপনাদের এ প্রশ্ন আলিমদের প্রতি নয়, স্বয়ং নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে, কিন্তু আপনাদের সে খবর নেই। কবির ভাষায় ঃ

حمله بر خود می کنی ائے ساده مرد
همچوں آں شیرے که بر خود حمله کرد

—হে সরলমনা! নিজের প্রতি আক্রমণকারী সিংহের ন্যায় আপনার বিরুদ্ধেই তোমার এ আক্রমণ।

প্রসঙ্গত আমাদের এখানকার জনৈকা মহিলার ঘটনা প্রণিধানযোগ্য, যে ঈদের চাঁদ দেখতে বেরিয়েছিল। ইতিপূর্বে সে বাচ্চার পায়খানা পরিষ্কার করেছিল। হাতের আঙ্গুলে ময়লার কিছু অংশ তখনো লেগে রয়েছে। নাকের ডগায় আঙ্গুল রাখা মেয়েদের অভ্যাস। সুতরাং নাকে আঙ্গুল রেখে চাঁদ দেখাতে ময়লার গন্ধ তার নাকে পৌঁছে। তখন সে বলে ওঠে—এবারের চাঁদ কেমন যেন পচা পচা। সে জাহিলদের অবস্থাও তদ্রূপ যারা আলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়, যে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয় না। নিজেদের যে বোঝার যোগ্যতা নেই সে খবরই তাদের জানা নেই। সহিস যদি কলেজের কোন অধ্যাপককে বলে—আমাকে গণিতশাস্ত্রের প্রথম সূত্রের পঞ্চম অংক বুঝিয়ে দিন। অধ্যাপকের বক্তব্য বুঝতে অক্ষম হয়ে সে যদি বলে—কি আবোল তাবোল বলল মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। তাহলে বলুন দোষ কার। অবশ্যই সহিসের ! কিন্তু মূর্খদের মতে তো অধ্যাপক সাহেব এতক্ষণ বকাবকিই করলেন। যেমন আমাদের এলাকায় একবার মেয়ে মহলে ওয়ায হলো। এক তাঁতীর স্ত্রীও সেখানে ওয়ায শুনতে আসে। কতক্ষণ চুপ থেকে যখন কিছুই তার বুঝে আসে না তখন বলতে থাকে—জানি না ছাই মাটি কি যে বলছে। বাস্তবিক সমস্ত ওয়ায তার নিকট ছাই তুল্য। এখন বলুন, তার এ অভিযোগ নিজের ওপর না ওয়াযকারীর প্রতি। তদ্রূপ উক্ত মোল্লাজীকে আমি শিক্ষা ধারায় বুঝাতে অক্ষম হলে সে দোষ কার। এদের বুদ্ধি-বিবেকের দৌড় এ পর্যন্তই।

মসজিদের মুতাওয়াল্লী এ ধরনের একজন লোককে অন্ধকার রাতে প্রতিদিন পায়খানায় বাতি রাখার হুকুম দেয়। একদিন সে বাতি রাখতে সেখানে যায়। কোনও শিক্ষার্থী তখন পায়খানায় বসা। তাকে লক্ষ করে সে বলতে থাকে মৌলভী মিঞা! চোখ বন্ধ কর, আমি আলো রাখব। জি হ্যাঁ, মজার কথা, সে তো তোমায় কাপড় পরা অবস্থায়ও দেখতে পাবে না আর তুমি তাকে উলঙ্গই দেখে নেবে। এখন এ ধরনের বিবেকহারাদের কি প্রকারে বোঝানো যায় যে, আয়াতে বর্ণিত ارجلكم -এর সম্পর্ক وجوهكم ও ايديكم এর সাথে। এটা মানসূব অবস্থায় মাতূফ মাজরূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

আরবী ব্যাকরণ না-জানা ব্যক্তির পক্ষে এ জবাব বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। এজাতীয় লোকের জন্য জবাব হলো—কুরআনের কুরআন হওয়া তোমরা যে উপায়ে অবগত হয়েছ, সে একই সূত্রে তোমরা হুকুম-আহ্‌কামও হাসিল কর। কুরআনের অর্থ

বোঝার অধিকার তোমাদের জন্য স্বীকৃত নয়। এ ব্যাখ্যা আমি এজন্য দিয়েছি কুরআন পাকের তরজমা বা অনুবাদ পড়ে আপনারা নিজেদেরকে যেন বিজ্ঞ মনে করে না বসেন। মানুষের মধ্যে এটা এক মারাত্মক ব্যাধি।

—তাওয়াসী বিল হক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯

৪৭. দোয়া কবূল হলে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যেত। সুতরাং ফল যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন দোয়াও কবূল হচ্ছে না এ ধরনের সন্দেহের জবাব।

এর জবাব হলো—দোয়া কবূল হওয়ার দুটি পর্যায় রয়েছে। (১) আবেদন গ্রহণ করা এবং তার ওপর বিবেচনার আশ্বাস দেয়া। (২) আবেদন অনুযায়ী ফায়সালা দেয়া।

বন্ধুগণ! হাকিমের নিকট আবেদন গৃহীত হওয়াও এক প্রকার মঞ্জুরি ও সফলতা। কোর্ট-কাচারিতে মোকদ্দমার আপীল করা হলে আপনারা লক্ষ করে থাকবেন সেখানেও তা গ্রহণের দুটি ধারা রয়েছে। প্রথমত, বিবেচনার জন্য আবেদন গৃহীত হওয়া। এটাও বড় ধরনের সফলতা। আর অগ্রাহ্য হওয়াটা আবেদনকারীর চরম ব্যর্থতার শামিল। অতঃপর সফলতার দ্বিতীয় পর্যায় হলো আপীল গ্রহণের পর সে অনুপাতে রায় দেয়া। বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ার পর এখন বুঝুন ঃ[১] اجيب دعوة الداع

(১) আয়াতাংশের মর্ম গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে প্রযোজ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে নয়। আয়াতের শব্দই এর প্রমাণ। কেননা এটাকে انى قريب (আমি নিকটবর্তী অবশ্যই) এ অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে নৈকট্যের বর্ণনা রয়েছে। যার দাবি হলো—আবেদন গ্রহণ করা, রায় শীঘ্র হোক বা বিলম্বে, পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে এর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ফায়সালা হবে আইনের ভিত্তিতে অথবা প্রার্থীর কল্যাণ দৃষ্টে।

মামলার বিবরণ দৃষ্টে হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণের অর্থ এই যে, প্রার্থীর আবেদন নাকচ না করে শুনানির জন্য গ্রহণ করা। অতএব اجيب অর্থ সকল দোয়াকারীর দরখাস্ত আমি গ্রহণ করি, তার প্রতি দৃষ্টি দেই, অযত্ন করা হয় না। এটাই কি কম কথা। ভাইগণ! দুনিয়াতে তো বিচারকের আদালতে কেবল দরখাস্ত গ্রহণ করার জন্য নানান তদবীর, কত সুপারিশ করা হয়। অতঃপর মনকে আমরা প্রবোধ দেই যে, যথাযথ আইনের বিচার হলে রায় আমার অনুকূলে আসবেই। এক্ষেত্রেও তদ্রূপ মনকে বুঝানো উচিত—দরখাস্ত আল্লাহ্‌র দরবারে যখন গৃহীত হয়েছে তাহলে আমার কল্যা-

১. আমি প্রার্থনাকারীর আবেদনে সাড়া দেই।

ণের বিপরীত না হলে অবশ্যই তা পুরা করা হবে। অন্যথায় এর বিনিময় অন্য কিছু পাওয়া যাবে। এ কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, দোয়া কবূলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বেলায় আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য পুরা করাটা বান্দার স্বার্থহানিকর হয় কিনা এতটুকু লক্ষ্য রাখা হয়। সুতরাং এটাও বিরাট সাফল্য। লক্ষ করুন, ছেলে পিতার নিকট পয়সা চায়। এখন তা গ্রহণ করার এক পর্যায় তো এই যে, স্নেহের সুরে পিতা তাকে বলল ঃ হ্যাঁ, তোমার দাবি মানলাম। অতঃপর পিতা কখনো নগদ পয়সাই দিয়ে দেয়, আবার কখনো বাজারে গিয়ে ক্ষতিকর বাজে জিনিস কিনে খাবে কিংবা ছেলের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে এ বিবেচনায় নগদ পয়সার পরিবর্তে নিজেই পয়সা দিয়ে কিছু কিনে দেয়। তাহলে কি ছেলের আবেদন পুরা হয়নি বলা হবে? আদৌ না। বরং বাহ্যত পুরা না হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পূর্ণ হয়েছে বলেই স্বীকার করা হবে। যেহেতু নগদ পয়সা অপেক্ষা তাকে উত্তম বস্তু দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ এখানেও বুঝতে হবে আল্লাহ্‌পাক যেমন প্রজ্ঞাময় তেমনি সর্বশক্তিমান, তিনি পরম দয়ালু এবং অনুগ্রহশীলও। উপরন্তু বান্দার প্রতি পিতা-মাতা অপেক্ষা সীমাহীন দয়ালু, তা সত্ত্বেও দাবি অনুপাতে দেয়া হয় না। তাহলে বুঝতে হবে আমাদের দরখাস্ত হুবহু পূর্ণ করা ছিল কল্যাণের পরিপন্থী। অতএব পরিবর্তে তিনি ভিন্নতর অনুগ্রহ দান করবেন। দুনিয়ার বিচারপতিগণ দরখাস্ত গ্রহণ করার পর রায় দেয়ার সময় তা পুরা করা আইনের পরিপন্থী কি-না কেবল এটুকু লক্ষ করেন। আইনবিরোধী হলে তা বাতিল করে দেন আর পরিবর্তে কিছুই দেন না। কিন্তু মহান আল্লাহ বিধানের সাথে এ-ও দেখেন যে, আবেদন পূর্ণ করা বান্দার কল্যাণ বিরোধী কি-না। কাজেই এভাবে আবেদন পূর্ণ হওয়াই প্রকৃত সফলতা। এতএব আল্লাহর ওয়াদাকৃত 'ইজাবত' তথা কবূলের অর্থ—আবেদন গ্রহণ করা, এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া। এ জাতীয় 'ইজাবত' নিশ্চিত বিষয় যার ব্যতিক্রম অসম্ভব। অতঃপর কবূলের দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দা যা চায় হুবহু তাই দেয়ার কোন ওয়াদা দেয়া হয়নি। বরং ان شاء (যদি তিনি ইচ্ছা করেন।) বাক্য দ্বারা গণ্ডিভূত ও শর্তায়িত করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা হলে পাওয়া যাবে অন্যথায় পাওয়া যাবে না। সুতরাং কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء

"তাঁকেই তোমরা বরং ডাক, তিনি ইচ্ছা করলেই কেবল তোমাদের আবেদন পূরণ করবেন।" কোন কোন আলিম اجيب دعوة الداع (প্রার্থনাকারীর আবেদন আমি পূরণ করি) আয়াতকেও ان شاء (তিনি যদি চান) দ্বারা শর্তযুক্ত করেছেন। আবার

কেউ কেউ একে লোপকৃত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমার মতে এটা শুদ্ধ নয়। কারণ অন্যত্র وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন—আমাকে তোমরা ডাক, আমি কবূল করব) আয়াতের পূর্বাপর অবস্থাদৃষ্টে প্রমাণ হয় যে, ডাকের প্রতি অবশ্যই সাড়া আসে। কেননা নির্দেশিত দোয়ার মঞ্জুরি অনিবার্য। এক্ষেত্রে ان شاء তথা 'যদির শর্ত বাস্তবতা বিরোধী। দ্বিতীয়ত, এখানেও انی قریب (অবশ্যই আমি নিকটে) এর পর اجیب دعوة الداع (প্রার্থনাকারীর আবেদন আমি কবূল করে থাকি) আল্লাহ নিকটবর্তী হওয়ার তাকীদযুক্ত আয়াতের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কবূল হওয়া ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত নয়। নতুবা 'কুরব' তথা নৈকট্য ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া ইল্‌ম ও বিশেষ সম্পর্ক উভয় দিক থেকেই বাস্তব সত্য বিষয়। যেহেতু তিনি বলেছেনঃ سبقت رحمتی علی غضبی (আমার রহমত গযব অপেক্ষা ব্যাপকতর)। সুতরাং আমার মতে اجیب শব্দ প্রথম অর্থে নয় দ্বিতীয় অর্থে ان شاء কথাটির সাথে শর্তযুক্ত। অতএব দোয়া কবূল হওয়ার পরও তাতে অনীহা-অবহেলার কি কারণ। কারো মনে যদি এ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে, তাহলে দোয়া সম্পর্কে অন্তরকে এভাবে প্রবোধ দিতে পারে যে, পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা আশংকা থাকা সত্ত্বেও অনিশ্চিত লাভের আশায় জীবনে কত কাজই তো করে থাকি। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু দোয়ার মধ্যে ক্ষতির প্রশ্নই আসে না, তাহলে এর সাথে এহেন অবহেলিত আচরণ কেন ? উপরন্তু দোয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এর দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দোয়া করা অবস্থায় প্রত্যেকেই গভীর চিন্তা দ্বারা তা অনুভব করে নিতে পারে। আর দোয়া সত্ত্বেও প্রার্থিত জিনিস হাসিল না হলে উপস্থিত ক্ষেত্রে অন্তত এটুকু হবে যে, মনের বল ও সান্ত্বনার ভাব প্রবল হয়ে উঠবে। আর এটা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্কের বরকত ও ফলশ্রুতি। দোয়া দ্বারা আল্লাহ-প্রেমিকদের এটাই একমাত্র কাম্য। মাওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

از دعا نبود مراد عاشقان

جز سخن گفتن باں شیریں دهاں

(দোয়ার মাধ্যমে সে শীরীযবান প্রেমাস্পদের সাথে কথা বলাই প্রেমিকজনের মূল উদ্দেশ্য)। এরি জন্য দোয়া কবূল কি কবূল নয় সেদিকে তার তিলমাত্র পরোয়াই থাকে না। কেননা মাহবুব আরযী শুনেছেন প্রেমিকের নযরে এটাই বড় কথা,

এতটুকুই যথেষ্ট। আর কবূলের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশ পাওয়াটা তার দৃষ্টিতে অতিরিক্ত দান ও নিয়ামত। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পর্ক করা উচিত, যার সহজতর পন্থা হলো, দোয়া। এর মাধ্যম ব্যতীত সম্পর্ক গভীর না হয়ে বরং ভাসা ভাসা থেকে যায়। আর একটু গভীরে চিন্তা করলে আল্লাহ্‌ থেকে নিজেকে দূরত্বে মনে হয়। তাই বন্ধুগণ! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহান আল্লাহ্‌ আমাদের নিকটে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমরা তাঁর থেকে যোজন দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ আগামী দিনে তাঁর সামনেই রয়েছে আমাদের নিশ্চিত উপস্থিতি। —আল-ইসাবাহ, পৃষ্ঠা ৭

৪৮. আমল ব্যতীত কোন দীনি সুফল প্রকাশ পায় না।

আমলের ক্ষেত্রে মানুষ দুই স্তরে বিভক্ত। প্রথমত, যারা শুধু বিশ্বাসগত পরিশুদ্ধিই যথেষ্ট মনে করে, আমলকে তেমন গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। এজন্য আমলের সংশোধন এবং এর পরিমাণ বাড়ানোর ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা "বিশ্বাস অপেক্ষা আমলের মান বেশি" একথা বললে আমাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক নেই, অস্বীকারও করি না, বাস্তবিকপক্ষে ঘটনা তাই। কিন্তু এর দ্বারা আমলের মূল্যহীনতা কি করে প্রমাণ হয় ? দ্বিতীয় পর্যায়ের বস্তু কি নিষ্প্রয়োজনীয় ? মূল অপেক্ষা শাখার মান যে কম তা আপনাদের জানা কথা কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রয়োজন নেই একথা কেউ বলতে পারবে না। কারণ গোড়া যতই শক্ত হোক কাণ্ডবিহীন অবস্থায় শাখা ফলবতী হয় না, এ কথা কে অস্বীকার করবে ? তদ্রূপ এখানেও বুঝুন—আমলবিহীন শুধু আকীদা ফলপ্রসূ নয়, অধিকন্তু এর দ্বারা খোদার অভীষ্ট কল্যাণও সাধিত হয় না। অবশ্য আমল ছাড়াও কোন কোন সময় ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু স্বয়ং সে অবস্থা বাঞ্ছিত নয়।

মোটকথা, যে সুফল আল্লাহ্‌র কাম্য সেটা আমল ব্যতীত হাসিল হয় না। কেননা কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে, আমল-আকীদা উভয়টির পরিশুদ্ধি ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য মূল আকীদার বিশুদ্ধির ভিত্তিতে কেউ কেউ হয় তো ফল পেতেও পারে কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র কথা। আল্লাহ্‌র ওয়াদা নেই হেতু তা নিশ্চিত নয়। প্রসঙ্গত তারা কেবল ঃ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ (যারা জানে আর যারা জানেন না তারা কি সমান ? আয়াতাংশই মুখস্থ করে ধারণা করে নিয়েছে যে, ইল্‌ম দ্বারা আকীদার সংশোধনই যথেষ্ট। কিন্তু এটা দেখেনি যে, কুরআনের বহু জায়গায় "আমলকারী এবং আমলহীন সমান নয়" একথাও পরিষ্কার বর্ণিত রয়েছে। তাহলে কুরআনের আয়াত শুনুন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

—দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর হিসেবে তাদেরকে সেসব লোকদের সমান গণ্য করব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ? তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ -

—ঈমানদার সৎকর্মশীল এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী আর মুত্তাকী ও পাপাচারী ব্যক্তিকে কি আমি একই পর্যায়ভুক্ত গণ্য করব ? আরো বলা হয়েছে ঃ

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوٗنَ

—মুমিন আর ফাসেক ব্যক্তি কি একই সমান ? এরা সমপর্যায়ের হতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, আমল ছাড়া দীনের বাঞ্ছিত সুফল লাভ করা আল্লাহ্র বিধান নয়। —আল-মুজাহাদাহ্, পৃষ্ঠা ৩

৪৯. মুজাহাদা ও সাধনা জরুরী মনে না করা ভুল

কেউ কেউ আমল করা জরুরী ঠিকই মনে করে কিন্তু তার সাথে অন্য কোন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। দৃশ্যত তাদের এ রায় ঠিকই মনে হয় যে, আমল-আকীদা উভয়টির গুরুত্ব তাদের নিকট স্বীকৃত কিন্তু এতেও এক ধরনের ত্রুটি থেকে যায়। তাহলো, বিশ্বাসগত পরিশুদ্ধির পর, আমলের সংশোধন, পরিপূর্ণতা এবং স্থিতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিছক ইচ্ছা-অনুভূতিই যথেষ্ট ধারণা করে নেয়া। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, আমলের সংশোধন সহজ করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত একটি বিষয়ও বিশেষ জরুরী, যদিও স্বাভাবিক নিয়ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ওপর সংশোধন নির্ভরশীল নয় যে, এর অভাবে কোনক্রমে তা সম্ভবই নয়। কিন্তু সহজ করতে হলে তার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এছাড়া আমল করা সম্ভব হলেও সহজ-সরলের বেলায় অবশ্যই তা ভিত্তি স্বরূপ। রেলগাড়ির দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। গাড়ি ছাড়াও দূরত্ব অতিক্রম করা চলে কিন্তু অতি কষ্টে। তদ্রূপ এক্ষেত্রে আকীদা পরিশুদ্ধির পর সে আনুষঙ্গিক বিষয় ছাড়াও আমল সম্ভব কিন্তু অনায়াসে নয়।

এ মুহূর্তে বিষয়টি ব্যক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। যার অর্থ না বোঝার দরুন আমলের বেলায় মানুষ মারাত্মক ভুল করে থাকে। মোটামুটি সে বিষয়টি হলো—নফসের মুজাহাদা এবং এর বিরোধিতা, যার অবর্তমানে আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে অনুপাতে আমল করা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এমনকি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দরুন কোন কোন সময় আমল করা অসম্ভবও হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে এর সাহায্যে আমল সহজ হয়ে যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তাই আমি প্রমাণ করব। অবশ্য এর সপক্ষে এখন নয় অন্য কোন সুযোগে আয়াতের আশ্রয় নেয়ার আমার ইচ্ছা রইল। কেননা আয়াতের অর্থ বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে। যাহোক মুজাহাদা বড় মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। অভিজ্ঞতার আলোকে গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। নামায ফরয এটা মুসলমান মাত্রেরই জানা বিষয়। পড়তেও সবার মনে চায়, না পড়াতে মনে বিষণ্নতা আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু লোক অলসতা করে নামায ছেড়ে দেয়। অথচ বিশ্বাসে একে সে ফরয বলেই জানে। একইভাবে স্বেচ্ছায় আবার কেউ কেউ পড়েও নেয়। কিন্তু অনেক সময় আবার কোন প্রতিবন্ধকতার দরুন সে ইচ্ছা অবদমিত হয়ে নিষ্ক্রিয়তায় রূপ নেয়। ফলে নামাযে স্থিতি আসে না। এ দ্বারা বোঝা যায়—আমলের স্থিতি ও কার্যকারিতার জন্য শুধু আকীদার পরিশুদ্ধি অথবা দুর্বল ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট নয় বরং দ্বিতীয় কোন আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে, যার ভিত্তিতে আমলের বাস্তবায়ন, স্থিতিশীলতা ও পরিপক্বতা হাসিল হয়। যার ওপর আমলের পরিপূর্ণতা নির্ভরশীল তা হলো ঃ নফসের মুজাহাদা ও বিরোধিতা। অতএব বে-নামাযী এ জন্যই বে-নামাযী যে, সে নফসের গোলামি করে এবং তাকে সযত্নে আরামে রাখে। বস্তুত নফসের মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করা হলে কারো পক্ষে বে-নামাযী থাকার প্রশ্ন আসত না। —আল-মুজাহাদাহ্, পৃষ্ঠা ৪

৫০. আম্বিয়াগণের ওপর আপতিত কষ্ট-মুসিবত গুনাহ্র পরিণাম সন্দেহ করা নিতান্তই ভুল ধারণা।

হকপন্থীদের মাযহাব হলো—নবী (আ)-গণ মাসুম—নিষ্পাপ, গুনাহ থেকে পবিত্র। কিন্তু খাশাবিয়ারা (সম্প্রদায় বিশেষ) তাঁদের যথাযথ মূল্য দেয় না এবং তাঁদেরকে নিষ্পাপও স্বীকার করে না। আমি বলব খাশাবিদের ধারণা কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী তো বটেই, যুক্তিরও বিরোধী। কেননা দুনিয়ার শাসকগণ কর্তৃক কারো ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার পূর্বে তার চরিত্র যাচাই করার নীতি অনুসরণ করা হয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুয়তের দায়িত্ব কি তাহলে বাছাই ছাড়াই অর্পণ করা হয় ? অথবা তাতে কি ত্রুটি থেকে যায় যে, এমন ব্যক্তিকে উক্ত পদে আসীন করা হবে যিনি

অপরকে তো বানাবেন আইনের অধীন আর নিজে করবেন বিরুদ্ধাচরণ ? একথা বিবেকসিদ্ধ হতে পারে না। অতএব সে সন্দেহের জবাব এই—আম্বিয়াগণের ওপর আপতিত ঘটনাবলী মূলত বিপদ ছিল না বরং এর রূপটাই ছিল কেবল মুসিবতের। এটা কোন রূপক অর্থ নয়, প্রমাণসিদ্ধ কথা। আমি একটি মাপকাঠি দিচ্ছি যার মাধ্যমে আপনাদের পক্ষে প্রকৃত বিপদ এবং আকৃতিগত মুসিবতের পার্থক্য ও পরিচয় লাভ করা অতি সহজ। তা এই যে, যদি বিপদের দরুন মনের অস্থিরতা বেড়ে যায় আর অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়, বুঝতে হবে এটা গুনাহ্‌র কারণে। পক্ষান্তরে যে বিপদের ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, আত্মসমর্পণ-স্পৃহা এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের আগ্রহে উন্নতি ঘটে তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেটা মুসিবত নয়, যদিও আকার-আকৃতিতে তা-ই। এখন প্রত্যেককেই নিজের মাথা নীচু করে নিজেই দেখে নিক বিপদকালে তার মনের অবস্থা কি হয়। অতএব এ মাপকাঠির ভিত্তিতে হযরত আম্বিয়া (আ) ও আউলিয়াগণের বিপদকে দুনিয়াদারের বিপদের সাথে তুলনা করা হলে দেখা যায়, এর ফলে নবী ও ওয়ালীগণের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা গভীর এবং আত্ম-নিবেদনে তাঁরা রয়েছেন উন্নতির চরমে। আর আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ তাঁদের ভাষায় ঃ

ا ے حریفان رآہ ھا رابستہ یار

آھوئے نیگم واو شیر شکار

غیر تسلیم ور ضاء کو چاراہ

در کف شیر نرخو نخوارہ

—হে বন্ধু! যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, শিকারী সিংহের কবলে পতিত হরিণের ন্যায় আমরা এখন নিরুপায় তাই রক্ত পিপাসু সিংহের কবলে পড়ে আত্মসমর্পণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

তাঁরা আরো বলেন ঃ

ناخوش تو خوش بود بر جان من

دل فدائے یار دل رنجان من

—তোমার অসন্তুষ্টি আমার জন্য সন্তুষ্টির কারণ, আমার মনে যাতনাদায়ী বন্ধুর পাদমূলে আমার জীবন উৎসর্গিত।

এটা খাশাবীদের বোকামি যে, তারা নবীগণকে নিজেদের সাথে তুলনা করে ধারণা করেছে তাঁরাও আমাদের ন্যায় মানুষ, গুনাহ তাঁদের দ্বারাও সম্ভব, আমাদের ন্যায় তাঁরাও বিপদের শিকার। কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান, তাও তাদের চোখে ধরা দেয়নি। এ জিনিসটিই মানুষের বিনাশ সাধন করেছে। আর এ কারণেই বহু কাফেরের ভাগ্যে ঈমান জোটেনি। নবী (আ)-গণের বাহ্যিক অবস্থাকে তারা নিজেদের সাথে তুলনা করে নিয়েছিল। তাই মাওলানা রূমী বলেছেন ঃ

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد

کم کسے زابدال حق آگاہ شد

گفتہ اینك ما بشر ایشاں بشر

ما وایشاں بستہ خوابیم وخور

ایں ندانستند ایشاں از عمی

درمیاں فرق بود بے منتہا

کار پا کاں را قیاس از خود مگیر

گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

—গোটা জগত এ-কারণে গোমরাহ্-পথহারা যে, ওয়ালী আল্লাহ্‌গণের খবর খুব কম লোকেরই জানা। তারা ভাবে—আমাদের ন্যায় তাঁরাও যেহেতু আহার-নিদ্রার মুখাপেক্ষী, কাজেই তারাও আমাদের মতই মানুষ। কিন্তু অজ্ঞতার দরুন এ দুয়ের মধ্যকার সীমাহীন ব্যবধান এরা জানতে পারেনি। তাই পুণ্যাত্মাগণের কার্যকলাপ নিজের সাথে তুলনা করো না, যদিও লেখনীতে شیر و شیر (শের ও শীর অর্থাৎ দুধ ও সিংহ) শব্দদ্বয়ের আকৃতি একইরকম।

অপর একজন আরেকটু অতিরিক্ত সংযোজন করে বলেছেন ঃ

شیر آں باشد کہ آدم می حورد

شیر آں باشد کہ آدم را خورد

—দুধ তো মানুষ পান করে আর শের তথা সিংহ মানুষ ভক্ষণ করে।

প্রিয় ভাইয়েরা! কোলে নেয়া দু-ধরনের। একে তো চোরকে ধরে মানুষ বগলদাবা করে। এ ক্ষেত্রে দাবানেওয়ালা সুন্দরী নারী হওয়া সত্ত্বেও সে খুশি হয় না। যেহেতু

প্রেমিক সে নয়। তাই সে চাইবে, এ থেকে পালিয়ে যেতে এবং এ চাপ তার মনঃপূত নয়। দ্বিতীয় প্রকার কোলে নেয়া হলো—প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে বগলদাবা করে, সজোরে চাপ দেয়। আপনারা এবার তাকে জিজ্ঞেস করুন সে কি বলে। এ কষ্টের কারণে কি সে প্রেমিকের বাহুবেষ্টন থেকে মুক্তি কামনা করবে ? মোটেই না, বরং ছন্দায়িত কণ্ঠে সে বলে উঠবে ঃ

نه شود نصیب دشمن که شود هلاک تیغت

سر دوستاں سلامت که تو خنجر آز مائی

—তোমার তরবারির আঘাতে প্রাণপাত করা শত্রুর ভাগ্যে যেন না জুটে, তোমার তলোয়ারের তীক্ষ্ণ আঘাত পরীক্ষার জন্য বন্ধুদের শির হাজির রয়েছে।

একইভাবে আল্লাহ্ পাকও দু'ধরনের মানুষকে চাপ দেন। এক তো দুর্বৃত্ত চোরকে, দ্বিতীয় স্বীয় প্রেমিককে । চোর তো আল্লাহ্র বেষ্টনীতে অস্থির, ঘাবড়ে যায়। আর তার প্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

خوشا وقت شورید کان غمش

اگر تلخ بینند دگر مر همش

گدایان از بادشاهی نفور

بامیدش اندر گدائی صبور

دما دم شراب الم در کشند

اگر تلخ بینند دم در کشند

—তার চিন্তায় বেদনাকাতর মুহূর্ত কতই না আনন্দের, একদিকে যদিও বিষাদের ছায়া, কিন্তু পরক্ষণে প্রলেপের আনন্দও রয়েছে। শাহী দরবার থেকে বিতাড়িত ভিক্ষুক অন্য সময় পাওয়ার আশায় ধৈর্য ধারণ করে। সর্বদা তারা দুঃখের মদিরা পান করে যায়, কষ্ট হলেও তারা ধৈর্যের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

এখন তো অবশ্যই আমাদের বুঝে আসার কথা যে, একটা হলো সঠিক অর্থে বিপদ, অপরটি কেবল আকার আকৃতিতে। প্রথমটি গুনাহ্র ফলশ্রুতি, দ্বিতীয়টি মান-মর্যাদা বৃদ্ধি এবং প্রেমের পরীক্ষার নিদর্শনস্বরূপ পতিত হয়।

—আকবারুল আ'মাল, পৃষ্ঠা ১৪

৫১. "দান করা বস্তু হুবহু মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে" মূর্খদের এ ভ্রান্ত আকীদার জবাব।

কোন কোন লোক প্রতি মৌসুমে নিজের বিগত আত্মীয়-স্বজনের নামে মৌসুমী জিনিস দান করে থাকে, বিশেষত যেসব বস্তু ছিল মৃতজনদের অধিক প্রিয়। শিক্ষিত সমাজ পর্যন্ত এতে লিপ্ত। এরা তো বরং এতটুকু অগ্রসর যে, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (নিজেদের প্রিয়বস্তু দান না করা পর্যন্ত তোমরা কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে না) আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণ খোঁজে যে, প্রিয় বস্তু ব্যয় করাই শরীয়তের কাম্য, তাহলে মৃত ব্যক্তির প্রিয় জিনিস খয়রাত করাতে ক্ষতি কি ? আমি বলি—আল্লাহ্ পাক مما تحبون (তোমাদের প্রিয় বস্তু) বলেছেন, مما يحبون (তাদের প্রিয় বস্তু) বলেন নাই। সুতরাং দানকৃত বস্তু দাতার প্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়, মৃতের নয়। কথাটার মর্মার্থ হলো—ইখলাস বা আন্তরিকতা ফযিলতের ভিত্তি। আর নিজের প্রিয় বস্তু দান করাতেই অধিক মাত্রায় ইখলাস বিদ্যমান, পরের প্রিয় জিনিস খয়রাতের মধ্যে নয়। এটা ছিল তাদের দলীলের জবাব। এখন আমি সে প্রমাণ উপস্থিত করব যদ্দারা বোঝা যাবে আমাদের দানকৃত জিনিসটি হুবহু মুর্দারের নিকট পৌঁছে না, পৌঁছে বরং এর সওয়াব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم

এ আয়াতের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ কুরবানীর গোশত-রক্ত আল্লাহ্র নিকট আদৌ পৌঁছে না, পৌঁছে বরং তোমাদের ইখলাস—আন্তরিকতা বা তাকওয়া। তোমরা কেবল আন্তরিকতারই সওয়াব লাভ করবে আর সে সওয়াবই মুর্দারগণকে পৌঁছে দেয়া হয় যদি তাদের নামে কুরবানী অথবা অন্য কোন দান-খয়রাত করা হয়। আপনাদের হয়তো জানা আছে—মুহাররামের শরবতের আকিদাগত বুনিয়াদ এটাই যে, কারবালার শহীদগণ পিপাসার্ত অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। কাজেই তাঁদের তৃষ্ণা মিটানোর জন্য শরবত পাঠানো চাই। কিন্তু প্রথমেই বোঝা উচিত যে, এ শরবত কখনো তাদের নিকট পৌঁছে না। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। দ্বিতীয়ত, এটা যুক্তিতেও টিকে না। আপনারা কি মনে করেন এখনো তাঁরা পিপাসায় ছটফট করছেন? বেহেশতী শরবত এখনো তাঁদের দেয়া হয়নি ? আপনাদের গড়া এ ধারণা ধন্য হোক। আমরা তো বিশ্বাস করি—আল্লাহ্র রহমতে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে বেহেশতের পূতঃপবিত্র শরবতের পেয়ালা তাঁদের দেয়া হয়েছে যা একবার পান করার পর চিরতরে পিপাসা দূর হবে, দ্বিতীয়বার পান করার দরকারই পড়বে না। তাদের সে

ভ্রান্ত আকীদার কুফল সময়ে এমনও দেখা যায় যে, কোন বছর শীতকালে মুহাররাম পড়ে, তখনো এক নাগাড়ে শরবতের বিলি-বন্টন ও তা পান করার ধুম চলতে থাকে। ফলে অনেকে নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ জাতীয় প্রথার গোলামি থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন। চিন্তা করলে দেখা যায় রেওয়াজের অনু-করণ সর্বদা অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুনই হয়ে থাকে। —দারুল-মাসউদ, পৃষ্ঠা ৮

বলা বাহুল্য, যাই কিছু দান করা হোক মৃতের নিকট অবিকল তাই পৌঁছে যায় এ ধারণার ভিত্তিতেই এসব প্রথা পালন করা হয়। অথচ ধারণাটাই ভুল। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, মৃতের প্রিয়বস্তু দান করার মূল দর্শন হলো, অন্তরের পরিতাপ আর মনের আক্ষেপ। আহা, অমুক বেঁচে থাকলে সেও আমাদের সাথে খেত, সে যখন নেই তো দান-খয়রাত করে দেই, যেন তার কাছে পৌঁছে যায়। এর কারণ হলো জান্নাতের নিয়ামতসমূহ আমাদের সামনে উপস্থিত নেই। যদি আমাদের অনুভূতি থাকত যে, বেহেশতের অফুরন্ত নিয়ামত এবং আনন্দে তাঁরা ডুবে আছেন, তাহলে আমাদের মনে মোটেই আফসোস থাকার কথা নয়। কেননা স্বাদে-গন্ধে জান্নাতী নিয়ামতের সাথে পার্থিব নিয়ামতের কোন তুলনাই করা যায় না। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ জান্নাতের নিয়ামতরাজির মধ্যে আনার, খেজুর ইত্যাদিকে দুনিয়ার আনার-খেজুরের সাথে যেন তুলনা করা না হয়। কেননা বেহেশতের এবং দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য কেবল নামের মধ্যে, নতুবা প্রকৃতিগতভাবে এ দুটি ভিন্নতর জিনিস। একটি ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে বিষয়টা আরো পরিষ্কার করা যায়। মাহমুদাবাদের রাজা একবার ভাইসরয়কে দাওয়াত করেন। এ উপলক্ষে রাজা দু'শ টাকা ব্যয়ে একটি আনার তৈয়ার করান। নামে আর আকারেই কেবল তা ছিল আনার সদৃশ, কিন্তু আসলে ছিল ভিন্ন জিনিস। এ প্রসংগে স্বয়ং কুরআনে বলা হয়েছে ঃ قوارير من فضة قدروها تقديرا অর্থাৎ জান্নাতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ চাঁদির আয়না সাজানো থাকবে, অর্থাৎ তা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ-পরিষ্কার দৃষ্ট হবে। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জান্নাত এবং দুনিয়ার জিনিসপত্রে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য কেবল নামের ক্ষেত্রে। নতুবা সেখানকার রূপা স্ফটিকসম দৃষ্টি ভেদ করে যায়, পার্থিব রূপায় এ গুণ কোথায় ? তাই এখন দুনিয়ায় বসে তোমাদের কামনা—আহা! মৃতেরা যদি দুনিয়ায় থাকত....আর তারা আক্ষেপ করছে আহা... তোমরা যদি সেখানে থাকতে...। আল্লাহ জানে এখানে এমন কি আছে যার জন্য মানুষ পাগল। কবির ভাষায় ঃ

زرو نقره چیست تا مفتوں شوی

چیست صورت تا چنیں مجنون شوی

অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ এমন কি মূল্যবান বস্তু যে, এর ধোঁকায় পতিত হবে, ছায়া-ছবিরই বা মূল্য কি যে, এর জন্য পাগল হবে ? সেখানকার নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জানতে হলে হাদীস থেকে জেনে নাও। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ জান্নাতী হুরদের মাথায় এমন সুন্দর ওড়না শোভা পাবে যার একটি দুনিয়ায় লটকিয়ে দেয়া হলে চাঁদ-সুরুজের আলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়তো। সেখানকার হুরদের এমনি রূপের বাহার যে, সত্তর প্রস্থ কাপড়ের ভিতর থেকে তাদের রূপের ছটা বাইরে ঠিকরে পড়বে। বেহেশতের মাটি হবে চুণি-পান্না এবং মেশক-আম্বরের উপাদান মিশ্রিত। হাউজে কাওসারের পানির গুণ হবে ঃ من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا "যে ব্যক্তি এ থেকে একবার মাত্র পানি পান করবে চিরদিন সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।" উপরন্তু মজার ব্যাপার এই যে, তৃষ্ণা ছাড়াই এর প্রতি তার আগ্রহ হবে এবং পূর্ণ স্বাদও পাবে। অথচ দুনিয়ার পানি কেবল তৃষ্ণাকালেই স্বাদের, এ ছাড়া বিস্বাদ। তাই বলুন—দুনিয়ায় এ জাতীয় পানির অস্তিত্ব কোথায় ? এর সাথে পার্থিব সমস্ত নিয়ামতের তুলনা করুন তাহলে বোঝা যাবে যে, এ দুয়ের মধ্যে কেবলমাত্র নামের সম্পর্ক, অর্থগত সামঞ্জস্য খোঁজা এক্ষেত্রে অবান্তর। কাজেই "আমার অমুক আত্মীয় বেঁচে থাকলে এখানকার নিয়ামত ভোগ করত" আক্ষেপ করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। বরং তাদের সামনে এসব বস্তু সামগ্রী উপস্থিত করলে সম্ভবত তাদের বমিই আসতে চাইবে। —ঐ পৃষ্ঠা-১০

৫২. "মাশায়েখগণ সময় সময় অযোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেন" এ সন্দেহের জবাব।

এ কথার জবাব এই যে, সম্ভবত অনুমতি দেয়ার সময় তিনি ছিলেন যোগ্যই, কিন্তু পরে গিয়ে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আর এ রকম হওয়াটা অসম্ভবও নয়। আকায়িদের কিতাবে আহলে সুন্নাতের আকীদা বর্ণিত হয়েছে ঃ السعيد قد يشقى অর্থাৎ সৎলোক কখনো কখনো দুর্ভাগা হয়ে থাকে।

—আল-আবদুর রব্বানী, পৃষ্ঠা ২৫

কাজেই এতে আপত্তির তেমন কিছু নেই। অধিকন্তু এটা الواصل لا يرد (তথা-সিদ্ধ পুরুষ বর্জনকারী হন না) প্রবাদ বিরোধী নয়। কেননা 'সিদ্ধ' এক্ষেত্রে 'বাস্তব' ও

'প্রকৃত' অর্থবোধক, শায়খের ধারণা অনুযায়ী নয়। সুতরাং الواصل لا يرد নীতিবাক্য সম্পূর্ণ সঠিক ও বাস্তবসম্মত কথা। হাদীসেও এর সমর্থন রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে ঃ وكذالك الايمان اذا خالط بشاشة القلوب —ঈমানের স্বাদ অন্তরে এমনিতর বদ্ধমূল হওয়ার পর তা থেকে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সাহাবীগণ তার এ মন্তব্য বর্ণনা করেছেন, কেউ তাতে আপত্তি তোলেননি। সুতরাং সাহাবীগণের স্বীকৃতি বলে এটা প্রমাণিত হয়ে যায়। এ প্রশ্নের অপর এক সূক্ষ্ম জবাবও রয়েছে যা ব্যক্ত করাই এখানে উদ্দেশ্য। কোন কোন সময় মাশায়েখগণ কোন অযোগ্য চরিত্রে লজ্জাশীলতার আধিক্য লক্ষ করে এ আশায় তাকে খলীফা নিযুক্ত করেন যে, অপরকে সংশোধন করার বেলায় লজ্জার খাতিরে ভবিষ্যতে নিজেও সে সংশোধিত হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে কামেল তথা সিদ্ধ পুরুষে পরিণত হবে। অতপর কোন কোন অযোগ্য শায়খের সে আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেয়। অবশ্য এটা বিরল ঘটনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবের সাক্ষী এটাই যে, যে ব্যক্তি-সত্তায় লজ্জার মাত্রা অধিক পরের সংশোধন করার কালে নিজের সংশোধনে সে অবশ্যই মনোযোগ দেয়। —ঐ, পৃষ্ঠা ২৬

৫৩. "আখিরাতের মুক্তি আমাদের আয়ত্তের বাইরে"—এ বিশ্বাসের অসারতা।

বস্তুত এ আকীদা কুরআন-হাদীস বিরোধী এবং নিতান্ত ভুল। এ বিরোধিতার দরুন যদিও কুফরীর ফতোয়া লাগানো হয় না, কিন্তু চরম মূর্খতা অবশ্যই বলা হবে। কুরআনের বহু আয়াত দ্বারা পরকালীন মুক্তি বান্দার আয়ত্তাধীন হওয়ার বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায়। সুতরাং আল্লাহ্র বাণী ঃ سَابِقُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ —(তোমাদের রবের ক্ষমা এবং আসমান-যমীনসম বিস্তৃত জান্নাতের প্রতি তোমরা ধাবিত হও।) এর মর্ম অনুযায়ী জান্নাতের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক প্রধাবনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করা যদি আমাদের আওতাধীন না-ই হয়, তা হলে سابقوا (ধাবিত হও) নির্দেশ বাক্যের কি অর্থ ? অতএব বোঝা গেল, এটা আমাদের আওতাধীন। কেননা আল্লাহ পাক বান্দাকে তার আওতাধীন বিষয়েরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন, এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের নহে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ لا يكلف الله نفسا الا وسعها (আল্লাহ্ কারো ক্ষমতার উর্ধ্বে বোঝা চাপিয়ে দেন না)। কারো প্রশ্ন জাগতে পারে "জান্নাত ও জাহান্নাম আমাদের দৃষ্টিসীমার ভিতরে তো নয় যে, আমরা দৌড়ে গিয়ে ভিতরে ঢুকব কিংবা বের হয়ে আসব অথবা দূরে সরে পড়ব।

এমতাবস্থায় জান্নাতের দিকে ধাবিত কিংবা জাহান্নাম থেকে বাঁচার কি উপায় ? বেশ, তাহলে শুনুন, কোন কাজ-কর্ম অধিকারভুক্ত হওয়ার দুটি দিক রয়েছে। এক ঃ মাধ্যমহীন সরাসরি এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। যেমন আহার করা, পানি পান করা এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। দুই ঃ মাধ্যমযুক্ত এখতিয়ারী বিষয়। যেমন যানবাহনে চড়ে দিল্লী, কলকাতা কিংবা বোম্বাই উপনীত হওয়া এ অর্থেই এখতিয়ারী বিষয়। কারণ এখান থেকে লাফিয়ে বোম্বাই পৌছা কার পক্ষে সম্ভব ? কিন্তু তা সত্ত্বেও একে এখতিয়ারীই বলা হয়। যার অর্থ—দূরত্ব অতিক্রমের জন্য মাধ্যম অবলম্বন করা। গভীর দৃষ্টির আলোকে বোঝা যায় অধিকাংশ এখতিয়ারী কার্যকলাপ এ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যেমন বিয়ে করে সন্তানের জন্মদান, কৃষি দ্বারা ফসল উৎপন্ন করা এবং ব্যবসার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করা। এসব বান্দার ইচ্ছাধীন। তাই বলে কি প্রয়োজনীয় মাধ্যমের আশ্রয় ছাড়াই যখন ইচ্ছা তখনি লাভ করা সম্ভব ? আদৌ না। বরং এসব বান্দার ইচ্ছাধীন হওয়ার অর্থ—এর উপায়-মাধ্যমের আশ্রয় নেয়া না নেয়া তার ইচ্ছার অধীন। উদ্দেশ্য—উপায় ধর, সম্ভবত অভীষ্ট বস্তুটি তোমার আয়ত্তে এসে যাবে। অতএব জান্নাত লাভ করা ইচ্ছাধীন এ অর্থে যে, এর মাধ্যম আপনার ইচ্ছার অধীন। কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করুন, দেখতে পাবেন আল্লাহ্ পাক জাহান্নাম থেকে বাঁচা এবং জান্নাতে প্রবেশের উপায় এবং তদবীর নির্দেশ করেছেন। সে সবের সঠিক অনুসরণ-অনুকরণ করতে থাকুন আল্লাহ্ আপনাকে জান্নাতে স্থান দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

واتقوا النار التى اعدت للكافرين

—তোমরা সে আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুফরী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপলক্ষ। পক্ষান্তরে سَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ আয়াতের পর বলা হয়েছে اعدت للمتقين (যা) প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। এর দ্বারা প্রমাণ হয়—তাকওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম। অতঃপর কুরআনের স্থানে স্থানে তাকওয়ার পরিচয় ও ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এরপরই বলা হয়েছে ঃ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ–